জীবজন্তুর আপন দেশে
পরিমল গোস্বামী

জীবজন্তুর আপন দেশে

পরিমল গোস্বামী

মুখার্জী ব্রাদার্স । কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৯০

প্রকাশক
সুকুমার মুখোপাধ্যায়
১৮এ, টেমার লেন
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর
শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়
করুণা প্রিন্টার্স
১৩৮, বিধান সরণী
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদশিল্পী
অহিভূষণ মালিক

মূল্য : দশ টাকা

জীবজন্তুর আপন দেশে

প্রথম অধ্যায়

চিড়িয়াখানায় নিশিপালন

আলিপুরের চিড়িয়াখানা তোমরা অনেকেই দেখেছ। কিন্তু রাত্রে দেখেছ কি ?

গভীর রাত্রে? যখন ঘরে ঘরে মানুষ ঘুমোয়, বনে বনে পশুরা ঘুমোয়, গাছে গাছে পাখীরা ঘুমোয়, তখন ? তখন তোমরা চিড়িয়াখানা দেখ নি। কি করেই বা দেখবে ? তখন শহরের পথে জেগে থাকে কেবল পুলিস আর চোর, চিড়িয়াখানায় জেগে থাকে বাদুড়।

মোটকথা এই রকমই আমার ধারণা ছিল আগে, কিন্তু একটি রাত চিড়িয়াখানায় কাটিয়ে আমার সব ধারণা ওলটপালট হয়ে গেছে।

সেখানে যে রাত কাটিয়েছি চিড়িয়াখানার লোকেরা কিন্তু তা জানে না, জানলে তার দেয়ালের বাইরে পথে রাত কাটাতে হত, সেখানে বাইরের লোকের রাত কাটাবার নিয়ম নেই যে। কিন্তু সে সব আইনের কথা এখন থাক, আমি সেই একটি রাত্রে সেখানে যে সব কাণ্ডকারখানা দেখেছি তা অবশ্য আমার দেখবার কথা নয়, কারণ আমি ইচ্ছে করে সেখানে থাকিনি।

ঐ যে হ্রদের ধারে লম্বা গাছটায় কালো কালো সব বাদুড় আকাশে পা তুলে যোগব্যায়াম অভ্যাস করেন, যার কাছে আগে লম্বা লম্বা জিরাফদের বাড়ি ছিল, মনে আছে সে জায়গাটা ? ফেজাণ্ট পাখীদের ঘর ডানহাতি ক'রে সেই দিকটায় যেতে সুন্দর একটি সাঁকো আছে। ফেজাণ্ট পাখীদের ঘর তোমরা ছেলেরা হয় তো বা ভুলেই গিয়েছ, কিন্তু তোমরা মেয়েরা কখনো ভোলনি, ভুলতে পার না ; কারণ তাদের গায়ে

এমন অদ্ভুত সব ছিট-ছিট ডিজাইন আঁকা আছে যে তোমরা মেয়েরা তারই সঙ্গে মিলিয়ে তোমাদের ব্লাউজের ছিট পছন্দ কর। আমি দেখেছি যে! কত দিন দেখেছি। আমরা বাজার থেকে ছিট কিনে ওখানে এসে মিলিয়ে দেখেছি, পছন্দকরা ডিজাইনের সঙ্গে মিলছে কি না।

এদের ঘরটারই ঠিক সামনে হ্রদের পাড়ে কয়েকটি ঘন পাতার গাছের নিচে একখানা বেঞ্চি পাতা আছে। সেদিন চিড়িয়াখানা ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সেই বেঞ্চিতে শুয়ে অলসভাবে হাঁসদের সাঁতার কাটা দেখছিলাম। কি যে আরাম হচ্ছিল! তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি, জানি না। আর শুধু আমি জানি না তাই নয়, চিড়িয়াখানার সুপারিনটেনডেন্ট স্বয়ং, আর যারা পশুপাখীদের দেখাশোনা করে তারা, কেউ জানে না।

রাত তখন দুটো। একটা শব্দে ঘুম ভেঙে যাওয়াতে প্রথমেই হাতের ঘড়িটার দিকে চোখ পড়ল। ঘড়িটার কাঁটাগুলো রাত্রে জ্বলে। কিন্তু আমি কোথায়? প্রথমে দু চার সেকেণ্ড মনেই পড়ল না আমি কোথায়। তারপর আস্তে আস্তে সব মনে পড়ল। ভয়ে গায়ে কাঁটা গজিয়ে গেল।

যখন বুঝলাম, এই গভীর রাতে আমি একা এই সব সিংহ বাঘ সাপ কুমীরের উপনিবেশে শুয়ে আছি, তখন গায়ের কাঁটা আরো শক্ত হয়ে উঠল, আর তার প্রত্যেকটি প্রায় ঘড়ির কাঁটার মতোই আলো ছড়াতে লাগল। কেন জান? আমি যে ভয়ে কাঁপছিলাম। তাই গায়ের কাঁটাগুলো পরস্পর ঘষা লেগে ফটফট আওয়াজ করছিল আর তাদের মাথায় মাথায় আলোর ফুলকি ঝিকমিক করছিল। ও সবই বিদ্যুতের খেলা আর কি।

চারধারে জনমানবের সাড়া নেই এবং নিশুতি রাত। চেঁচাতে গিয়ে চুপ করে গেলাম। গলা দিয়ে ঠিকমতো আওয়াজ বেরোল না। মনে পড়ে গেল কি একটা শব্দে জেগে উঠেছি, যেন কেউ লাফিয়েছে আমার কানের কাছে।

কিন্তু সেই ভয়ানক রাত্রে তারপর কি সব কাণ্ড ঘটল, তা বলতেও বুক কেঁপে উঠছে। কারণ আমার জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

কে আমার কানের কাছে মানুষের ভাষায় অথচ পশুর গলায় বলে

উঠলেন—কে তুমি এখানে, বড় যে চোরের মতো রাত্রে আমাদের উপনিবেশে ঢুকে পড়েছ? জান, এখানে রাত্রে মানুষের প্রবেশ নিষেধ? বলি, গোয়েন্দা-টোয়েন্দা নও তো?

এই শুনে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি আর কি! আমার গায়ের চামড়া ব্যাঙের মতো ভিজে উঠল, গায়ে কুমীরের মতো কাঁটা গজিয়ে গেল, মাথার চুল সজারুর কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠে আবার ঝম-ঝম শব্দ করতে লাগল, আর তা থেকে যে বিদ্যুতের আলো জ্বলতে লাগল তা জোনাকির আলোকে হার মানায়। আমি কাঁপতে কাঁপতে বেঞ্চি থেকে পড়ে গিয়ে তার হেলান দেওয়া পিঠের সঙ্গে দু খানা পা আটকা পড়ে বাদুড়ের মতো ঝুলতে লাগলাম।

কিন্তু এমন অবস্থাতেও সেই জন্তু আমাকে বলেন কি না চালাকি ক'রে ঝুলে থাকলে চলবে না।

ওঁকে জন্তুই বললাম, কারণ উনি যে মানুষ নন, তা গলার আওয়াজে আর গায়ের গন্ধে বুঝতে পারছিলাম। চেহারাটাও একটু একটু দেখতে পাচ্ছিলাম। তিনি খুব কড়া গলায় বললেন, বল তুমি কে, এবং এখানে কেন এসেছ, নইলে তোমার কপালে কি আছে তা তো জান না? এখন এখানকার বাঘ সিংহ ভালুক সবাই খাঁচা থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়েছে, একটু খবর পেলেই তোমার দফা শেষ। জান তো বাঘ সিংহ সবাই এক জাদুকরের কাছ থেকে খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসার বিদ্যা শিখেছে?

আমি প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক'রে বেঞ্চিতে আটকে যাওয়া পা ছাড়িয়ে নিয়ে মাটিতে বসে পড়লাম, এবং কাতর সুরে বললাম, "দয়া ক'রে আপনি কে আগে বলুন, আমি আমার সব কথাই আপনাকে বলছি। আমি ইচ্ছে ক'রে এখানে আসিনি, আপনার পায়ে পড়ি, সিংহ বা বাঘের কাছে আমার বিরুদ্ধে কিছু বলবেন না।"

আমার এই নরম কথায় জন্তুটির মন ভিজল, আমার উপর তাঁর বড়ই দয়া হল। বললেন, "আমি ক্যাঙারু।"

"ও, ক্যাঙারু ? তাই বলুন। আপনার কথা শুনে প্রথমেই আমার মনে একটা ভক্তির ভাব এসেছিল। আমি আপনাদের কথা অনেক জানি। আপনারা হচ্ছেন থলেধারী জন্তু। ইংরেজীতে আপনাদের গুষ্টির নাম—মারসিউপিয়াল কোয়াড্রুপেডস। এই নাম দেওয়া হয়েছে কারণ আপনাদের পেটের সঙ্গে মারসিউপিয়াম আছে, মানে থলে আছে। আপনাদের দেশ হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এবং কাছাকাছি কয়েকটা দ্বীপে। নিউ গিনীতেও আপনাদের এক জ্ঞাতি আছে।

ক্যাঙারু এইটুকু শুনেই গদ্‌গদ হয়ে বললেন, বাস, আর কিছু বলতে হবে না। তুমি আমাদের বংশের পরিচয় যখন জান, তখন তুমি আমাদের বন্ধু লোক, তোমাকে সব বলছি, শোন। আমি হচ্ছি এই চিড়িয়াখানার পোস্টম্যান, ডাকপিওন। আমার পেটে যে থলে আছে তাইতে সব চিঠি গোঁজা আছে, তাই এখন বিলি ক'রে বেড়াচ্ছি ঘরে ঘরে। বাঘ সিংহদের চিঠি বিলি হয়ে গেছে, এখন বাকী কেবল কচ্ছপ কুমীরদের। আজ চিঠি বেশি নেই, শুধু গাধার নামে একটি বুক-পোস্ট আছে।"

আমি তো শুনে অবাক। এখানে চিঠি বিলি হয় সবার কাছে, চিঠি লেখেনই বা কে এবং এখানে আনেনই বা কে ? তা ছাড়া ওঁরা চিঠি লিখতে পারেন, পড়তে পারেন, এবং মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারেন, এ কি অসম্ভব কাণ্ড। একবার মনে হল স্বপ্ন দেখছি না তো ? নানাভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলাম, না স্বপ্ন নয়, কারণ স্বপ্ন এতটা অলীক হয় না, এমন আজগুবি হয় না।

ক্যাঙারুকে সোজা জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কি ক'রে সম্ভব আমাকে একটু বুঝিয়ে দেবেন ?"

ক্যাঙারু বললেন, "না বোঝবার মতো কিছু নয়। তোমরা চিরকাল পশুপাখীর মুখে মানুষের ভাষা বসিয়ে কত কাহিনী রচনা করেছ, তা কি ভুলে গেলে ?"

"না ভুলিনি, রূপকথা, হিতোপদেশ, ঈসপের গল্প সবই মনে আছে।"

"অথচ এ সবই তো কল্পনা ক'রে লেখা ?"

"নিশ্চয় কল্পনা ক'রে।"

"আজ তুমিও যদি একটুক্ষণের জন্ম"—ক্যাঙারু বললেন—"একটুক্ষণের জন্য সেই রকমই কল্পনা কর, তা হলে ক্ষতি কি! আজ এই অন্ধকার রাতে যখন আমরা কেউ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না, যখন তুমি এই বিরাট পশুশালার সমস্ত খাঁচা থেকে বেরিয়ে আসা পশুর মধ্যে একা মানুষ বিষম ঝুঁকি ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, তখন একটুখানির জন্যও যদি কল্পনা কর তোমাদের আর আমাদের মধ্যে কোনো তফাত নেই, তা হলে ক্ষতি কি ?"

ক্যাঙারুর কথাগুলো বড়ই ভাল লাগল, বললাম, "আমি তো কল্পনা করতেই ভালবাসি।"

ক্যাঙারু বললেন, "তাহলে মিনিট দুই অপেক্ষা কর, আমি এই কাগজের প্যাকেটটি গাধাকে দিয়ে আসি, নইলে এক বিষম কাণ্ড বেধে যাবে।"

"কিসের প্যাকেট ? আর দেবেই বা কাকে ? গাধা তো এখানে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।"

"গাধা আছে এখানে। জিব্রাদের মধ্যে একটি নকল জিব্রা আছে। এক গাধা গায়ে ডোরা কেটে জিব্রা সেজে আছে। সে মানুষের কাজ করবে না বলেই এখানে এসেছে। সে ডাক যোগে গান শেখে কোনো এক গানের স্কুলে। তোমরা যাকে করেস্‌পন্‌ডেন্‌স স্কুল বল, সেই রকম এক স্কুল।"

"ডাক যোগে গাধা গান শেখেন ? বলেন কি ?"

"ঠিকই বলছি। এই প্যাকেটে গানের দ্বিতীয় পাঠ আছে। গান রেকর্ড করাবে, এই ওর আশা।"

"কিন্তু গাধা জিব্রা সেজে আছেন, আপনারা এ প্রতারণা সহ্য করেন কেন ?"

"ও যে বেকার। তাই ও আমাদের আশ্রিত, আর তাই

ওকে আমরা ধরিয়ে দিই না। আমাদের পশুসঙ্ঘের ওরা যে বিশিষ্ট সভ্য।"

ক্যাঙারু লাফিয়ে লাফিয়ে চলে গেলেন, আর আমি এখানকার

এই অদ্ভুত সব ব্যাপারের কথা ভাবতে লাগলাম। কিন্তু ওঁরা চিঠি পান কোত্থেকে এবং চিঠি বাইরে থেকে নিয়ে আসেন কে, তা ভেবে পেলাম না। এমন সময় ক্যাঙারু লাফাতে লাফাতে ফিরে এলেন। এসে একটুও না হাঁপিয়ে সহজভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভয় পাওনি তো একা একা ?"

আমি বললাম, "না, ভয় পাইনি কিন্তু একটা কথার মীমাংসা করতে পারছি না। আপনারা বাইরে থেকে চিঠি পান, কিন্তু চিঠি আসে কেমন ক'রে ?—এ তো আমি কিছুতে বুঝতে পারছি না।"

ক্যাঙারু হেসে বললেন, "এই কথা ? তবে শোন, কিন্তু বলে দিও না কাউকে। বাইরে থেকে চিঠি আনে কারা জান ? বাইরে থেকে যে সব হাজার হাজার টীল—মানে যে সব হাঁস উড়ে আসে, তারা। দিনের বেলা এই চিড়িয়াখানার জলে তাদের ভাসতে দেখেছ তো ? এত আসে যে জল ঢাকা প'ড়ে যায়। কত জায়গা থেকে যে ওরা আসে! এর জন্য ওরা সপ্তাহে সপ্তাহে মজুরি পায়, নইলে বুঝতে পারছ না, দেশে এত জল থাকতে ওরা এখানে আসে কেন ? এটা যে ওদের চাকরি। কথাটা বুঝে দেখ।"

আমি বুঝতে পারলাম, বললাম, "আপনার কথাই ঠিক, তা কোন্ কোন্ দেশ থেকে ওঁরা চিঠি আনেন ?"

"এই তো বাঘের চিঠি এসেছে আজ বিলেত থেকে।"

"বলেন কি ? বিলেত থেকে, সেখানে বাঘের কে আছেন ?"

"বলছি শোন। এখানে এই চিড়িয়াখানায় যে বাঘটা প্রায় সারা দিন গর্জন করে খাঁচার মধ্যে, তার বাড়ি জলপাইগুড়ি জেলায়, কিন্তু তার ছোটভাই থাকে বিলেতের হুইপস্নেড পার্কে।"

আমি বললাম, "এ নাম তো কখনো শুনিনি, হুইপ—কি বললেন ?"

"হুইপস্নেড পার্ক।"

"সে কি শ্রদ্ধানন্দ পার্ক, হৃষীকেশ পার্কের মতো? বাঘের ছেলে-মেয়েরা খেলা করে সেখানে?"

খ্যাঁকখ্যাঁক করে হেসে ক্যাঙারু বললেন, "আরে না না। পার্কের আর এক অর্থ হচ্ছে যে সব পশুকে মানুষ শিকার করে তাদের রক্ষার জন্য ঘেরা জমি। আমিই কি আগে জানতাম? ওখানে আমার নিজেরই এক মাসি থাকত, তার চিঠি থেকে জানতে পেরেছি। কিন্তু" —একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্যাঙারু বলল—"সে মারা গেছে সেদিন, আমার মেসো অস্ট্রেলিয়া থেকে এক চিঠি লিখে জানিয়েছে।"

বলতে বলতে ক্যাঙারুর গলাটা ধ'রে এলো, বোধ হয় তিনি চোখও মুছলেন হাত দিয়ে।

আমি বললাম, "তবে থাক ও সব কথা।"

ক্যাঙারু বললেন, "না না, ও কিছু না, শোন। বাঘের ভাই বিলেত থেকে লিখেছে সে সেখানে বেশ সুখে আছে, কারণ তাকে এমন এক উপনিবেশে রাখা হয়েছে যেখানে খাঁচা নেই, ঠিক যেমন বাংলাদেশে হিমালয়ের কোলে থাকত। তা ছাড়া পূর্ববঙ্গের এক বাঘিনী আছে সেখানে। সে দন্ত্য-স কে 'হ' বলে। তার একবার দাঁতের অসুখ হয়েছিল, দাঁতের ডাক্তার গিয়ে বলল, "শো মি ইওর টীথ।" মানে তোমার দাঁত দেখাও। বাঘিনী বুঝতে পারে না। তারপর পশ্চিম বাংলার বাঘ ওকে বুঝিয়ে দিল, বলল, ডাক্তার বলছে 'হো মি ইওর টীথ।' তখন বুঝল। তবে এতদিনে ওরা দুজনেই মোটামুটি কাজ-চলা গোছের ইংরেজী শিখে গেছে, এখন ইংরেজী ভালই বলতে পারে। কিন্তু পার্কের খাঁচাহীন উপনিবেশের কথা শুনে আলিপুরের ঐ বাঘটা কি রকম অস্থির হয়ে পড়েছে, তা ওর দিকে চাইলেই বুঝতে পারবে। দিনের বেলা দেখে নিও।"

"কেন, অস্থির হয়েছেন কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

ক্যাঙারু বললেন, "নিজে খাঁচার মধ্যে আছে ব'লে। বলছে "স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায়রে, কে বাঁচিতে চায়। লণ্ডনের

এবং অন্য সব শহরে যেখানেই বন্দী পশু আছে সবাই ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠছে ; আরও অনেক কিছু হচ্ছে।”

আমি বললাম, “হাঁসেরা যে চিঠি নিয়ে আসেন, নিয়ে যান আর আপনারা যে চিঠি বিলি ক'রে বেড়ান, এর মধ্যে বেশ একটা বন্ধুত্ব-ভাবের পরিচয় দেখছি।”

ক্যাঙারু বললেন, "হ্যাঁ, পরস্পর সহযোগিতার জন্যই এটা সম্ভব হয়েছে, আর এইভাবে দুনিয়ার পশুপাখী ক্রমে একও হচ্ছে। যে হাঁসেরা এয়ার মেল বয়ে বেড়ায় তারা এর জন্য ভাল মাইনে পায়, প্রশংসাও খুব পায়। তাছাড়া ধর না কেন, আমাদের সবার মধ্যে এতে এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে উঠেছে, যা তোমরা মানুষেরা কল্পনাই করতে পার না। তবে বলতে পার, আমরা হিংসা করি কেন? কিন্তু সে তো পেটের দায়ে। তোমরাও পশুপাখী খাও। ঐ ভাবেই আমাদের গড়া হয়েছে, আমরা কি করতে পারি বল? কিন্তু আমরা নিজেরা নিজেদের খাই না, তোমরা মানুষেরা কিন্তু নিজেরা নিজেদের খাও। তাই নয় কি?"

আমি চুপ ক'রে ভাবতে লাগলাম।

ক্যাঙারু বললেন, "যাকগে ও সব, আমি আসছি একটু পরেই এই চিঠিগুলো বিলি ক'রে।"

ক্যাঙারু চলে গেলে আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলাম সব। সত্যি কথাই বলেছেন ক্যাঙারু। মানুষে মানুষে শত্রুতা কবে যে ঘুচবে! একটা অস্ট্রেলিয়ার পশুর কাছে আমি মানুষ হয়ে লজ্জা পেলাম, মনটা একটু দমে গেল।

ক্যাঙারুর ফিরতে দেরি হল না, এবং এসেই বললেন, "খুব ভাল খবর আছে।"

"কি রকম?"

"পার্কের কথা বলছিলাম না? এই চিড়িয়াখানার বাসিন্দারাও মস্ত এক দরখাস্ত লিখেছে বাংলাদেশে একটা পার্ক তৈরির জন্য। জাতীয় পশু উপনিবেশ, মানে ন্যাশনাল পার্ক একটা আমাদের চাই। মানুষেরা বাঘ, হরিণ, গণ্ডার, এ সব প্রাণীকে লুকিয়ে লুকিয়ে মেরে এদের বংশ নাশ ক'রে ফেলছে, তাই পার্ক চাই। অরক্ষিত স্যাংচুয়ারি নয়, পশুরক্ষার খুব ভাল ব্যবস্থা চাই, আর আমরা সবাই সেই পার্কে এক সঙ্গে বাস করতে চাই।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "দরখাস্ত কার কাছে পাঠাবেন আপনারা?"

"কেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।"

"এতে সবাই সই করেছেন?"

"সবাই নয়, কারণ সবাই তো আর ভারতীয় পশু নয়। জিরাফ, জিব্রা, জলহস্তী, আমি, এতে সই করিনি, কারণ আমরা বিদেশীরা সই করলে সবাই সন্দেহ করবে, বলবে এরা কাজের নয়, প্র্যাকটিক্যাল নয়, এরা স্বপ্নবিলাসী, তাই চিড়িয়াখানায় থেকে থেকে আজগুবি সব কল্পনা করছে। তাই সই করিনি, তবে এতে আমাদের সহানুভূতি রয়েছে ষোল আনা।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম, "আমাদের দেশে যারা খাদ্যে ভেজাল মেশায়; ওষুধে, পথ্যে, ভেজাল মেশায়, তাদেরও তো আমরা বলি পশু। এর পরে কি তারাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দরখাস্ত পাঠিয়ে বলবে, পুলিসের হাতে আমাদের বংশ লোপ হলে পৃথিবীর একটি আশ্চর্য ভারতীয় পশুকে আর দেখা যাবে না, অতএব আমাদের রক্ষার জন্য একটা পার্ক বানিয়ে দাও?"

ক্যাঙারু গম্ভীর সুরে বললেন, "জোচ্চোর মানুষকে পশু বললে পশুকে অপমান করা হয়।"

আমি তৎক্ষণাৎ আমার ভুল বুঝতে পেরে ক্ষমা চেয়ে নিলাম। বুঝলাম ক্যাঙারু বেশ জ্ঞানী পশু। হঠাৎ আমার মনে একটা সন্দেহ জাগল। জিজ্ঞাসা করলাম, "দরখাস্তে বাদুড় সই করেছেন কি?"—বাদুড়ের আশ্রয় যে গাছটা তার কাছেই বসে ছিলাম, তাই মনে এলো কথাটা। মনে এলো আরও এই জন্য যে ওঁরা দেশী হলেও এখানকার পোষা জন্তু নন।

ক্যাঙারু বললেন, "তা বুঝি জান না? এক জিরাফকে দিয়ে বাদুড়দের কাছে বলানো হয়েছিল, কিন্তু ওরা কথা শুনতে রাজি হয় নি।"

"জিরাফকে দিয়ে বলানো হল কি ক'রে ? ওঁরা তো কথা বলতে পারেন না ?"

"আছে সে এক রহস্য, এখন ভাঙব না। কিন্তু জিরাফকে দিয়ে বলানো হয়েছিল এই জন্য যে তার গলা লম্বা, সে বাদুড়ের প্রায় কানের কাছে গিয়ে বলতে পেরেছিল। কিন্তু বাদুড় কি বলেছিল জান ? বলেছিল, 'আমার কাছে কেন ? আমরা তোমাদের খাই, না পরি ? আমরা স্বাধীন। এই গাছ আমাদের স্বাধীন উপনিবেশ, এদেশে যেমন গোয়া রাজ্য। বেশি বিরক্ত করো না, করলে বিদেশী সামরিক সাহায্য চেয়ে বসব'।"

"তারপর কি হল ?"

"আর কিছু হয়নি। কিন্তু ও কথা থাক। শোন, তোমার কথা আমি সবাইকে বলে দিয়েছি"—

"অ্যাঁ! কি সর্বনাশ!"

"না, ভয় নেই। গোরিলা খুব চালাক, সে বলল, 'ঐ মানুষটাকে আমাদের কাজে লাগাও। আমাদের আবেদনখানা ওর হাতে দিয়েই পাঠিয়ে দাও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে।' তাই সেখানা তোমার কাছে একেবারে নিয়েই এসেছি। তুমি কথা দাও, এখানা তোমাদের মুখ্যমন্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেবে ?"

আমি বললাম, "নিশ্চয় দেব, কিন্তু এখান থেকে বা'র হব কি ক'রে ? সকাল হলেই যে ধরা পড়ে যাব।"

ক্যাঙারু বললেন, "কোনো ভয় নেই, একটুক্ষণ অপেক্ষা কর।"

ক্যাঙারু আবার তিনলাফে অদৃশ্য হয়ে গেলেন এবং মিনিট দুই পরে ফিরে এসে বললেন, "আমি একা আসিনি এবারে, ভয় পেয়ো না, আমার সঙ্গে জিরাফ আছে, বাঘ আছে।"

ক্যাঙারুর কথায় বিশ্বাস করেছি আগেই, তাই আর ভয় পেলাম না, বললাম, "বেশ তো কি করতে হবে বল।"

বাঘ ঠিক শরতের মেঘের মতো মধুর স্বরে গর্জন ক'রে বললেন, "দরখাস্তখানা যেন ঠিক জায়গায় পৌঁছয়।"

জিরাফ বললেন, "সে বিষয়ে আমি দায়ী রইলাম, ছেলেটি বড়ই ভাল।" তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন, "এই দড়িগাছা নিয়ে আমার সঙ্গে চল।"

আমি কোনো কারণ জিজ্ঞাসা না ক'রে দড়ি নিয়ে জিরাফের সঙ্গে চললাম। জিরাফ চিড়িয়াখানার প্রাচীরের কাছে গিয়ে থামলেন, এবং বললেন, "দড়ি বুকে আর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নাও।"

তখন অন্ধকার প্রায় কেটে গেছে। আমি সেই দড়ি বুকে আর কোমরে জড়িয়ে বেঁধে নিলাম। মতলবটা মনে মনে বুঝতে পারলাম। আমার বাঁধা শেষ হতেই জিরাফ দড়ি কামড়ে ধ'রে আমাকে উঁচুতে তুলে নিলেন ; ঠিক যেন জাহাজ থেকে ক্রেনে ক'রে মাল নামানো হচ্ছে, দেখতে তেমনি হল। চড়ক গাছে ঝোলার ছবিটাও মনে এলো।

তারপরেই প্রাচীরের বাইরে ঝুপ ক'রে শব্দ হল, অবশ্য সেটা আমারই নিচে পড়ার শব্দ। হাড়ে বেশ চোট লেগেছিল, কিন্তু ভিতরে থেকে ধরা পড়ার কষ্টের চেয়ে এ ব্যথা অনেক ভাল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সুন্দরবনে মানবসপ্তাহ পালন

চিড়িয়াখানার ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। আমি পশুদের দরখাস্ত আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পৌঁছে দিয়ে ছিলাম যথা সময়ে। একখানা চিঠিও পেয়ে ছিলাম, তাতে লেখা ছিল "বিষয়টি আমাদের বিবেচনাধীন আছে।"

ঐ বছরেই আমার চিড়িয়াখানা থেকে মুক্তি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই সুন্দরবনে আন্তর্জাতিক পশুপাখীরা একটি মানব সপ্তাহ পালন করে ছিলেন সেই খবরটাই জানাচ্ছি।

আমি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বাঘেদের যে চিঠি পৌঁছে দিয়েছিলাম, তাতে বেপরোয়া বন্যপ্রাণী হত্যার বিরুদ্ধে আবেদনও ছিল, আর তারই ফলে ১৯৫৫ সনের জুলাই মাসের প্রথমে একটা বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালন করা হয়ে গেল। বাঘেদের লেখা সে আবেদন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে না পৌঁছলে এটা হতেই পারত না। বন্য প্রাণী সপ্তাহ পালন মানে মানুষেরা বন্য পশুদের প্রতি এক সপ্তাহ ভালবাসা দেখাবে, বন্যপশু মারবে না এবং সভাসমিতি ক'রে তাঁদের প্রতি মানুষের এই ভালবাসার মনোভাবের কথা সব জায়গায় প্রচার করবে।

এ দিকে তো মানুষেরা বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালন করল, ওদিকে কি হল তার খবর আর কে রাখে। ওদিকে মানে সুন্দরবনে। মানে বন্যপ্রাণী জগতে।

সেই কথাই বলছি। সেখানে বন্যপশুরাও প্রচার করলেন তাঁরা এক সপ্তাহ মানুষ মারবেন না। আর এই কথা জানিয়ে আমাকে তাঁরা একখানা চিঠিও পাঠালেন। কিন্তু আমার নাম ঠিকানা তাঁরা

জানলেন কি করে ? আমি চিঠি পেয়েই ছুটে গেলাম চিড়িয়াখানায়। গিয়ে বাঘকে সব বললাম। বাঘ বললেন, "জানি সব, আমিই তো তোমার নাম ঠিকানা সুন্দরবনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। আমাদের চিঠি দেওয়া-নেওয়া কেমন করে হয় সে তো তুমি আগেই শুনেছ।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম "সপ্তাহ পালন সম্বন্ধে আপনার মত কি ?"

বাঘ বললেন, "মন্দের ভাল।"—বলেই একটু ভাবতে লাগলেন গম্ভীর হয়ে। তারপর বললেন "বড় গোলমেলে সব। কারণ পশুবধও একেবারে বন্ধ হবে না মানুষ বধও একেবারে বন্ধ হবে না। আপাতত এক সপ্তাহও যদি বন্ধ থাকে, থাক।"

অবশ্য এসব কথা অন্য মানুষের সামনে হয়নি। আমি বাঘের ফোটোগ্রাফ তুলব বলে বিশেষ অনুমতি নিয়ে খাঁচায় ঢুকেছিলাম। আমার সঙ্গে বাঘের সেবায়েৎ একজন ছিল, আমাকে বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাবার জন্য। সে তো আর জানে না যে আমাদের মধ্যে কি রকম ভাব হয়ে গেছে। আমি এই সেবায়েৎকে একটু দূরে সরিয়ে দিয়ে আলাপ করেছিলাম, তাকে বলেছিলাম বাঘ বশ করার বিদ্যে আমার জানা আছে, তোমাকে কাছে থাকতে হবে না। সেও দেখল কথাটা সত্যি তাই সে আর কাছে থেকে খবরদারি করেনি।

আমি নির্দিষ্ট দিনে সুন্দরবনে গিয়ে পৌঁছলাম। শুনে অবাক হবে, আমি একা গেলাম সেই বাঘ সাপ কুমীরের রাজত্বে। হাতে মাত্র একখানা শৌখিন ছড়ি, মাথাটা তার হাতীর দাঁতের। ছড়ি নিলাম, কারণ একটি সপ্তাহ যেখানে প্রেমের ছড়াছড়ি, সেখানে ছোরার বদলে ছড়িই তো একমাত্র সঙ্গী হওয়া ভাল। বন দেখলেই যারা বন্দুক নেয় আমি তাদের দলে নেই।

সুন্দরবনের কাছাকাছি আসতেই সকল দেহেমনে রোমাঞ্চ জাগল। আমাকে দেখতে পেয়ে অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষ থেকে কয়েকজন ছুটে এলেন। তাঁদের মধ্যে শুয়োর শেয়াল আর সাপ উল্লেখযোগ্য। কেউটে সাপ দেখে একটু ভয় পেয়েছিলাম, কি জানি যদি ছোবল

মারেন। কিন্তু তিনি সত্যিই ছোবল মারলেন আমার পায়ে জুতোর উপর। আমি ভয়ে চীৎকার করে উঠলাম। সাপ বললেন, "ভয় নেই, তোমার জুতো পরীক্ষা করে দেখলাম। তুমি পশুর চামড়ার জুতো
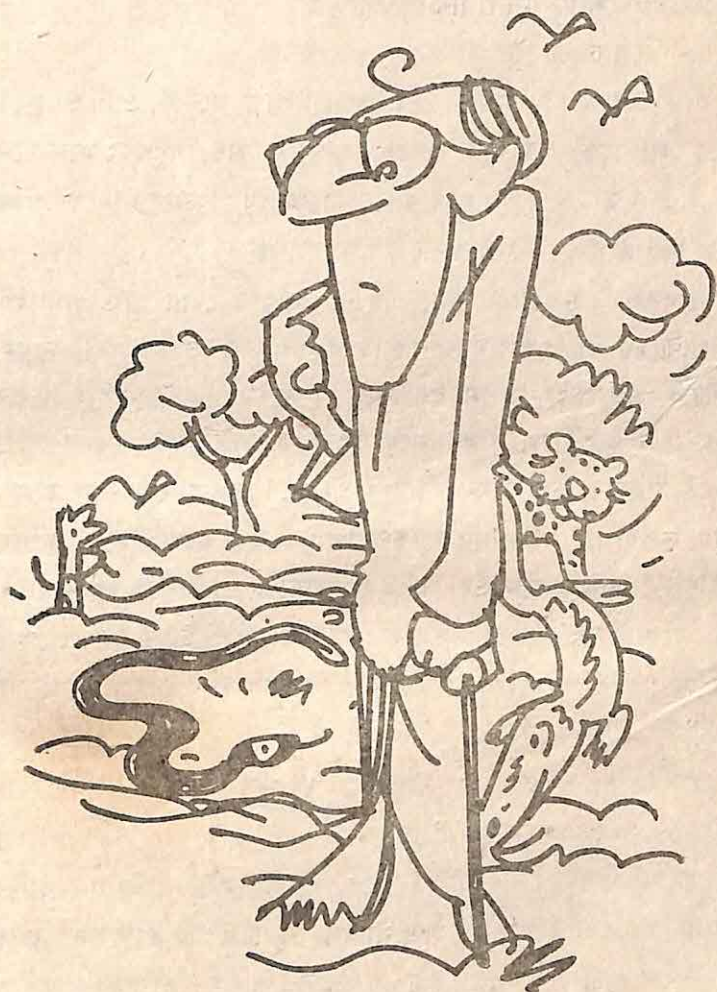
পরে এসেছ, ওটা ভাই এখানে এখন চলবে না, পশুরা অপমান বোধ করবে, অতএব জুতোজোড়া এখানে খুলে রাখ।"

আমি জুতো খুললাম। তারপর দেখি শেয়াল আমার ছড়ির দিকে

বাঁকা চোখে চেয়ে আছেন। তিনি বললেন, "ছড়ির মাথাটাও তো দেখছি হাতীর দাঁতের। ওটাও চলবে না ভাই। ছড়িটাও এখানে রেখে দাও। আচ্ছা, তোমার বোতাম কি হাড়ের ?"

আমি বললাম, "না প্ল্যাস্টিকের।"

"তা হলে চলবে।"

ইতিমধ্যে আমার আসার কথা শুনে অন্যান্য অনেক প্রাণীও ছুটে এলেন আমাকে অভ্যর্থনা করতে। আমি অভ্যাসবশতঃ মনে মনে ভয় পেলেও তা চেপে রাখলাম, মাঝে মাঝে শুধু হিংস্রদের দিকে আড় চোখে চাইছিলাম, কিন্তু তাঁরা টের পাননি কিছু।

সুন্দরবনে ঢুকতেই বেশ একটা আরাম বোধ হতে লাগল। পশুপাখীদের এই প্রথম মানব-সপ্তাহ পালন, তাই ওঁরা পৃথিবীর সকল প্রাণীকে এই উৎসবে নিমন্ত্রণ করে বসেছেন। এঁরা সবাই শিশুর মতো কচি এবং নিষ্পাপ মন নিয়ে উৎসবের আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। চারদিকে ট্যাঁ ট্যাঁ, গাঁ গাঁ, হিস্‌হিস্‌, হুয়া হুয়া, হালুম হুলুম, হুপহাপ, কিচিরমিচির, ত্নপদাপ! তার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে ওঁরা সবাই চলেছেন। কেউটেকে পাশে দেখে ভুল করে হঠাৎ একবার চমকে উঠতেই কেউটে তা বুঝতে পেরে বললেন, "আজ আমরা সবাই তোমার বন্ধু, আজ সব ভুলে শুধু আনন্দ কর।"

আমি খুব লজ্জিতভাবে বললাম, "অনেক দিনের অভ্যাস কিনা, কিছু মনে করবেন না, ভাই।"

ক্রমে এগিয়ে চলেছি সভার দিকে, আর দেখছি বিচিত্র সব প্রাণীর চেহারা। কেউ এসেছেন সমুদ্রে সাঁতার কেটে, কেউ এসেছেন নদীর স্রোতে গা ভাসিয়ে, কেউ এসেছেন বনপথে, কেউ এসেছেন আকাশ পথে। আসামের গণ্ডারও এসেছেন এক দল।

একটি গণ্ডার চলছিলেন আমার সঙ্গে। সভায় আসবেন বলে গলায় একটি চাদর জড়িয়ে নিয়েছেন। বইতে পড়েছি ওঁদের মগজের

ওজন খুবই কম। গলায় চাদর জড়ানো দেখে কথাটা বিশ্বাস হচ্ছিল। আমি অবাক হয়ে দেখছিলাম, গণ্ডার একটু হেসে বললেন, "অবাক হবার কিছু নেই, আজকাল একটু দেশী পোশাক পরতে ইচ্ছে করে। জন্ম থেকে চামড়ার হাফপ্যান্ট পরে আছি। ইংরেজ রাজত্বে এক রকম চলে যেত, কিন্তু এখন স্বাধীন দেশে বিদেশী পোশাক কেমন যেন বেখাপ্পা লাগে।"

কথাটা হয় তো ঠিক, কিন্তু তবু তাঁর এই মজার পোশাকে না হেসে থাকা গেল না। অন্য প্রাণীরাও হাসতে লাগলেন চাদর দেখে। আমি বললাম "সবাই ঠাট্টা করছেন, চাদরটা ফেলেই দিন।"

গণ্ডার বললেন, "ঠাট্টা করছে করুক, আমার যা ভাল মনে হয়েছে করেছি, জান তো আমার গায়ে যে চামড়াটি আছে সেটি কার?"

বললাম "আপনারই আবার কার?"

গণ্ডার বললেন, "তার মানেই হচ্ছে আমার গায়ে গণ্ডারের চামড়া ও সব ঠাট্টা আমার গায়ে লাগে না। জান না, গণ্ডারের চামড়া কত পুরু আর শক্ত?"

গণ্ডারের জ্ঞানের বহর দেখে অবাক হলাম। নিজেদের সম্বন্ধে ওঁরা এত কম জানেন! তবে আমরা মানুষেরাই বা মানুষ সম্বন্ধে এমন বেশি কি জানি। কিন্তু তবু সে জানা গণ্ডারের মতো অত কম জানা নয়। গণ্ডারদের ধারণা ওঁদের চামড়া ভীষণ শক্ত। অবশ্য ও ধারণা মানুষই ওঁদের জন্মিয়ে দিয়েছে। আসলে কিন্তু গণ্ডারের চামড়া অসম্ভব শক্ত কিছু নয়। এ নিয়ে অনেক আগেই তো পরীক্ষা হয়ে গেছে। এক ভদ্রলোক এই মিথ্যা বিশ্বাসে তাঁর পোষা গণ্ডারের গায়ে গুলি চালান, ভেবেছিলেন গুলি চামড়া ভেদ করতে পারবে না। কিন্তু গণ্ডারটাকে এইভাবে মেরে ফেলে তাঁর কি দুঃখ যে হয়েছিল।

কিন্তু এ কথাটা আর ওঁকে বললাম না, কথাটা ঘুরিয়ে অন্য কথা পাড়লাম, বললাম "কড়া গণ্ডার দিন তো শেষ হয়ে গেল।"

গণ্ডার চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেন শেষ হবে কেন?"

বললাম, "জানেন না বুঝি? দশমিক প্রথা চালু হয়ে যাচ্ছে। চৌষট্টি পয়সার টাকাও থাকবে না, কড়া গণ্ডাও থাকবে না, অবশ্য কড়াগণ্ডা শুধু ধারাপাতেই ছিল এতদিন, এখন আর সেখানেও থাকবে না।"

গণ্ডার বললেন, "দেখ, অর্থনীতির কথা বুঝি না, নেমন্তন্ন চিঠি পেয়ে এসেছি, সভার কথা পাড়। তুমিই কি আজ আমাদের প্রধান অতিথি?"

"তাই তো কথা আছে। সভাপতি হবেন ডুয়ার্সের হাতী, তিনি পৌঁছে গেছেন বোধ হয়?"

বাঘ বললেন, "না, তিনি আজ পৌঁছতে পারবেন না, একদিন দেরি হবে, খবর পাঠিয়েছেন। ওঁর এক সন্তানকে নেহরুজি রাশিয়ায় পাঠাবেন উপহার হিসেবে, তাই সবাই একটা বিদায়সভা করেছে, তাই।"

ইতিমধ্যে আমাকে এগিয়ে নেবার জন্য আরও কয়েকজন এসে পড়লেন। হরিণ, কুমীর, কচ্ছপ, আর কয়েকটি পেঙ্গুইন পাখী। পেঙ্গুইনরা এসেছেন দক্ষিণ মেরু থেকে। দেখলাম ওঁদের প্রত্যেকের মাথায় একটি করে আইস ব্যাগ বাঁধা। ব্যবস্থাটা সুন্দরবনের বাসিন্দারাই করে দিয়েছেন, নইলে গরমের দেশে ওঁরা বাঁচতেই পারতেন না। রাস্তার দুধারে বানরেরা সিংহমার্কা নিশান হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভলান্টিয়ার ওঁরা সবাই। এ উৎসবে সিংহ একটিও আসতে পারেনি বটে, এবং বাংলাদেশে বাঘ যদিও পশুরাজ (কারণ বাংলাদেশে সিংহ নেই), তবু ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর দেশেই সিংহের বাস ব'লে ওঁরা মানব-সপ্তাহের জন্য সিংহকেই অহিংসার চিহ্ন রূপে মেনে নিয়েছেন।

সভার অতিথিদের দেখে এমন হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সত্যিই তো আর হাসা যায় না সেখানে। বক্তৃতা দিয়েছিলাম খুব গম্ভীর ভাবেই। বক্তৃতার সময় চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম সবার দিকে, কুমীর, সাপ, বাঘ,

গণ্ডার সবারই চোখে মুখে বেশ একটা মানবীয় ভাব। ভয় হল না কিছু। মানুষ বন্যপ্রাণী সপ্তাহ পালন করছে, এ যে কত বড় একটা মহৎ ভবিষ্যতের আরম্ভ মাত্র তা বুঝিয়ে বললাম ; এবং বন্যপ্রাণীদের এই মানব-সপ্তাহ পালন যে আরও মহৎ, সে কথাটি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম। সবাই আনন্দে হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

বাঘ দাঁড়িয়ে বললেন, "সহ-অস্তিত্ব নীতি সবারই পরীক্ষা ক'রে দেখা উচিত। যে যার সীমানায় থাকো, যদি অন্যের সীমানায় যেতে হয় তবে বন্ধু হিসেবে যাও, শত্রু রূপে নয়, তা হলেই দুনিয়ার মঙ্গল।"

এক হরিণ ভয়ে ভয়ে বললেন, "আমার মতে মানুষ, বাঘ, কুমীর ইত্যাদি প্রাণীরা যদি নিরামিষ খাওয়া অভ্যাস করেন তা হলে সহ-অস্তিত্ব নীতি পালন করা অনেক সোজা হবে।"

বাঘ এ কথায় যেন একটু বিরক্ত হলেন, বললেন, "বছরে এক সপ্তাহ নিরামিষ খাব, এটাই কি কম? তা ভিন্ন, যার যা খাওয়ার অভ্যেস, তা তারা ছাড়বে কি ক'রে? তোমরা হরিণেরা যেমন নিরামিষ খাও, তাই তোমরা তা ছেড়ে মাংস খেতে পার না ; আমরাও তেমনি মাংস ছেড়ে নিরামিষ খেতে পারি না।"

হরিণ বললেন, "মানুষেরা পারে কি ক'রে?"

বাঘ সামান্য উত্তেজিত হয়ে উঠলেন এ কথায়, বললেন, "মানুষেরা ভণ্ড, প্রতারক, ওরা সুযোগ বুঝে এক এক মূর্তি ধরে, ওদের কথা ছাড়ো।"

আমি একটু প্রতিবাদের সুরে বললাম, "আপনাদের অতিথি আমি, একেবারে প্রধান অতিথি। আমাদের জাত সম্বন্ধে যা বললেন, তাতে যে খুব খুশি হয়েছি তা নয়। যা বলেছেন তা খুব সম্ভব সত্যি, কিন্তু তবু তা কি আজ এই সভায় না বললেই চলত না?"

সবাই একসঙ্গে ব'লে উঠল, "ঠিক কথা, কথাটা অন্যায় হয়ে গেছে, মাপ চাইছি।"

বাঘ বললেন, "সত্যিই অন্যায় হয়েছে, আর বলব না। মুশকিল

হয়েছে কি জান, আমরা ভণ্ডামি করতে জানি না, সত্যি কথা জিভের আগায় এসে পড়ে।"

সাপেরা হিস্‌হিস্ শব্দে বাঘকে সমর্থন জানালেন। আর সাপেদের সেই সম্মিলিত হিস্‌হিস্ শব্দে হঠাৎ চমকে উঠে ডজনখানেক ব্যাঙ তিন লাফে সেখান থেকে ছুটে গিয়ে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

সভায় আরও অনেকে বক্তৃতা দিলেন, অনেকে গান গাইলেন। গাধা ও কোকিলের দ্বৈতসঙ্গীত বেশ জমেছিল। হাজার হাজার মৌমাছি সম্মিলিত গুঞ্জনে সভার পরিবেশ আরও মধুর ক'রে তুললেন। ওঁরা মধুমক্ষিকা কিনা, ওঁদের গুঞ্জরণ মধুর তো হবেই।

কয়েকটা বানর আমার খাবার আয়োজন করতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আমার ব্যাগে কিছু খাবার ছিল, বললাম, "এ বেলার মতো চলে যাবে যা সঙ্গে আছে, আপনারা ব্যস্ত হবেন না।" কিন্তু কে কার কথা শোনে, ওঁরা আরও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

বাঘ বললেন, "ও বেলা কি খাবে বল, মাননীয় অতিথি তুমি, তোমাকে তো আজই ছাড়ছি না, সাতদিন এখানে থাকতে হবে। এখন বল, কি ব্যবস্থা করা যায়?"

ভাবনায় পড়লাম, তাই তো, কি খাওয়া যায়। বললাম, "যা দেবেন, তাই খাব, খাওয়ার মধ্যে এমন কি আছে, মন যদি খাঁটি থাকে, তবে আর ভাবনা কি?"

ভালুক পাতার ঠোঙায় খানিকটা মধু এনে বললেন, "এটা আগে খেয়ে নাও তো, দাদা।"

গোরু এসে বললেন, "আমার দুধ দুইয়ে নাও।"

বানর আনলেন পাকা কলা।

কুমীর বললেন, "জঙ্গলের মধ্যে নদীতে নৌকা বাঁধা আছে কয়েকখানা। তাতে মানুষ নেই, কয়েকজনকে বাঘে খেয়েছে, কয়েক-জনকে আমি। সেই সব নৌকোয় চাল ডাল ঘি সব প'ড়ে আছে, রান্না করে খেতে পার।"

হরিণ সলজ্জভাবে মাথা নিচু ক'রে বললেন, "চাল ডাল বোধ হয় আর নেই।"

আর কিছু বলতে হল না তাঁকে, সবই পরিষ্কার বোঝা গেল। কিন্তু আমার কোনো অসুবিধেও হল না তাতে। দুধ মধু কলাতেই বেশ তৃপ্তি পেলাম। দেখলাম মানুষের তুলনায় এরা অনেক ভাল। একবার মনে হল এখানেই থেকে গেলে কেমন হয়?—কথাটা বলেও ফেললাম হঠাৎ।

ইতিমধ্যে ছটা দিন কেটে গেল হৈ-হুল্লোড় ক'রে। কিন্তু হঠাৎ একটা খবরে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল, ভয়ও হল খুব। একটা চড়ুইপাখী কোত্থেকে উড়ে এসে আমার কানে কানে বললেন, "কাল সকালে মানব-সপ্তাহ শেষ হচ্ছে, কাল থেকে বাঘেরা মানুষ খাবে।"—বলেই সে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল।

হঠাৎ আমার চমক ভাঙল। তাই তো এর পর মানুষও জন্তু মারবে—জন্তুও মানুষ মারবে। অতএব এখুনি পালানো চাই।

সামনে আর একটি মাত্র রাত, তারপর? বাঘ মহাশয় আমার ঘাড় মটকাবেন। কি বোকা আমি, এত দেরি করে ফেলেছি, এখন সমস্ত রাত হাঁটলেও বাঘের এলাকা পার হয়ে মানুষের এলাকায় পৌছতে পারব কি না সন্দেহ।

বাঘকে বললাম, "দাদা, এখুনি আমার রওনা হওয়া দরকার।"

বাঘ হোহো ক'রে (আসলে হালুমহুলুম ক'রে) হেসে বললেন, "সে কি কথা? এই না বললে, আমাদের সঙ্গেই থাকবে?"

এমন সময় এক হৈহৈ কাণ্ড। সবাই মিলে হায় হায় করছেন আর বলছেন, ছি ছি কি লজ্জা, কি লজ্জা! এগিয়ে গিয়ে দেখি পশুদের ভিড়ের মাঝখানে আসামের সেই গণ্ডারটি মাটিতে পড়ে ছটফট করছেন, আর বলছেন, "না না তোমাদের কোনো দোষ নেই, আমি ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার খাওয়া নিষেধ, ওতে আমার অ্যালার্জি, তাই একটুখানি খেয়ে সমস্ত গায়ে ভীষণ চুলকুনি বেরিয়ে গেছে।"

গণ্ডার অতিথি, তাঁর এই দুরবস্থায় সবাই লজ্জায় প'ড়ে গেছেন, কিন্তু কোনো উপায় নেই। গণ্ডার বললেন, "ঠিক হয়ে যাবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, চুলকুনি ঘণ্টা দুয়ের বেশি থাকে না"—ব'লে মাটিতে গড়াতে লাগলেন।

আমরা সরে এলাম ওখান থেকে। বাঘ বললেন, "তা হলে নিতান্তই যাবে?"

"যেতেই হবে" ব'লে পা বাড়ালাম।

বাঘ বললেন, "চল, আমিও তোমার সঙ্গে যাচ্ছি, যাবেই যখন, এগিয়ে দিয়ে আসি, ওরা সবাই গণ্ডারকে নিয়ে ব্যস্ত আছে, থাক্?"

তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে, আমি ওঁর কথায় বড়ই ভয় পেয়ে গেলাম, বললাম, "না না, আমি একাই যেতে পারব, আপনি কেন কষ্ট করবেন অকারণ?"

বাঘ বললেন, "কিছু না, আমার খুব আনন্দই হবে, চল।" ব'লে একবার আকাশের দিকে চাইলেন, মনে হল কোনো নক্ষত্র দেখার চেষ্টা করলেন, সময় কত জানবার জন্য। মঘা নক্ষত্রটি তখন ঠিক প্রায় মাথার উপর দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু বাঘ কি উদ্দেশ্যে আকাশের দিকে চাইলেন আমি ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু ভয়ে আমি প্রায় অস্থির হয়ে উঠলাম। কালই বাঘের হাতে আমার মরণ হবে ভাবতে আমার গা ঘেমে উঠল, তারপর কি হল মনে নেই।

যখন জ্ঞান হল, দেখি সকাল হয়েছে। সকাল হয়েছে তবু বেঁচে আছি কেন? সত্যিই বেঁচে আছি তো? কে আমাকে বাঁচাল? ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখি তিন চারটি হনুমান আমার মাথার কাছে বসে আছেন। আমি তাঁদের দিকে চাইতেই একজন বললেন, "বাঘ আমাদের কাল এখানে পাঠিয়েছিলেন তোমাকে পাহারা দেবার জন্য, তুমি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে তাই। তিনি একখানা চিঠিও পাঠিয়েছেন তোমার নামে।"

চিঠিখানা নিয়ে পড়তে লাগলাম:

বন্ধু, তোমার সন্দেহ অমূলক। তোমাকে খাওয়ার মতলব থাকলে সে কথা তোমাকে আগেই জানিয়ে দিতাম। তুমি পশুদের পক্ষ নিয়ে তাদের যে উপকার করেছ, তার জন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। উপ-কারীকে আমরা মারি না তোমাদের মতো। ইতি, তোমার বন্ধু, বাঘ।
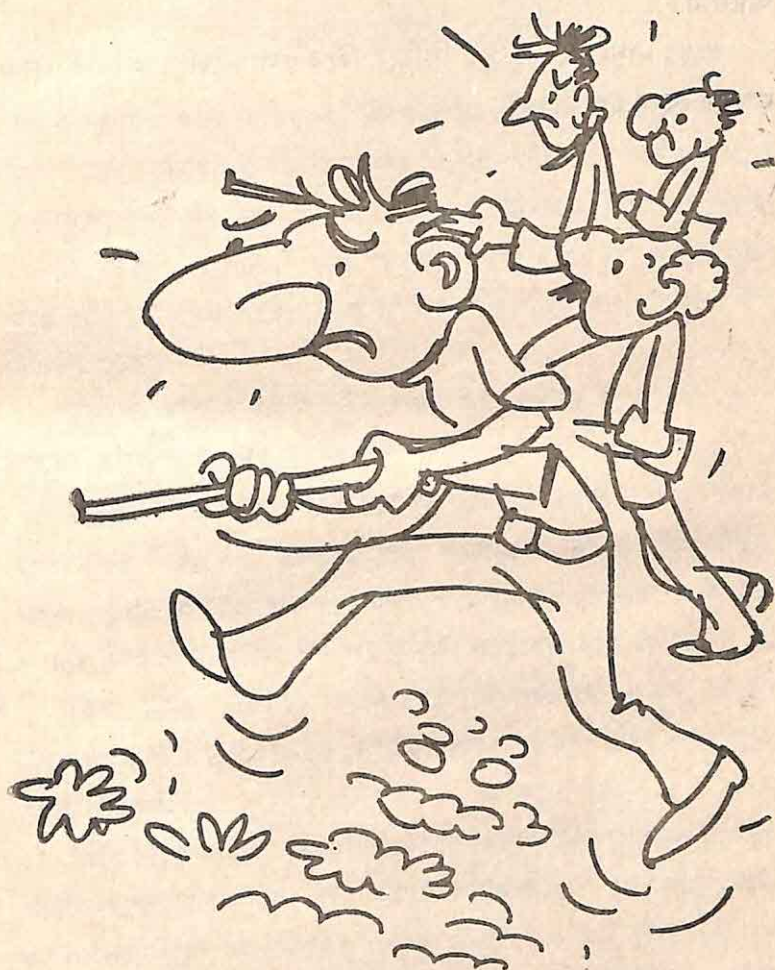
চিঠিখানা পড়ে কি যে লজ্জা হল আমার। আমি আবার ফিরে যাব বাঘেরই কাছে এই মনে ক'রে উঠে দাঁড়ালাম, কিন্তু হঠাৎ দেখি

কয়েকজন মানুষ বন্দুক হাতে সেই জঙ্গলে ঢুকছে। আমি তাদের বাধা দিলাম। বললাম, এ কাজ ক'রো না তোমরা, ওদের মানব-সপ্তাহ উৎসব পালন চলছে, এবং শুধু সপ্তাহ নয়, ওরা ছ মাস এই উৎসব পালন করবে। অতএব চল ফিরে যাই, এখনও হিংসার সময় আসেনি।

ওদের নানাভাবে বুঝিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম দেশে, আমার আর জঙ্গলে ফেরা হল না।

তৃতীয় অধ্যায়
সুন্দরবনে ফুটবল খেলা

মানব-সপ্তাহ শেষে বাড়িতেই ফিরে এলাম, কিন্তু মনটা বড়ই খারাপ হয়ে গেল। বড়ই লজ্জা হতে লাগল নিজের ব্যবহারে। আমি বাঘকে সন্দেহ করলেও বাঘ আমাকে ক্ষমা করেছেন, আমাকে নিরাপদে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছেন, এতে বাঘের চোখে নিশ্চয় আমি খুব ছোট হয়ে পড়েছি। আর এই কথাটি যতই ভাবছি ততই মন আরো বেশি খারাপ হচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে শেষে ঠিক করলাম সুন্দরবনে আবার যাব এবং বাঘের কাছে ক্ষমা চেয়ে আসব।

অতএব ফিরে আসার ঠিক্ চারদিন পরেই আবার রওনা হলাম সুন্দরবনের উদ্দেশে। প্রাণের ভয় করলাম না, কারণ আমি মানুষ, আমার কাছে প্রাণের চেয়ে মান বড় হওয়া উচিত। একটা চড়ুইপাখী আমার কান না ভাঙালে এই গণ্ডগোলটা আর হত না।

কিন্তু আমি ঠকিনি। আর শুধু তাই নয়, দ্বিতীয় বার এখানে ফিরে না এলে একটা মস্ত বড় আনন্দ থেকেই বঞ্চিত থাকতাম। চড়ুই পাখীকে ধন্যবাদ।

গিয়ে দেখি আনন্দ কলরবে সুন্দরবন মেতে উঠেছে। আমার সেই পরম বন্ধু বাঘের সঙ্গে দেখা হতেই, আমি হাত জোড় ক'রে বলতে যাচ্ছিলাম, "দাদা, ক্ষমা চাইতে এসেছি, কিন্তু 'ক্ষমা' পর্যন্ত উচ্চারণ করতেই বাঘ আমাকে দেখে অতি আনন্দে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন "তোমার অভাবে আনন্দ সম্পূর্ণ হচ্ছিল না, তুমি এসে আমাদের বড় উপকার করেছ, চল চল—"

বাঘ আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন একটা খোলা জায়গায় সেখানে অনেক বিদেশী পশু এসে জড়ো হয়েছেন। তাঁরা মানব-সপ্তাহ উৎসবে ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারেননি, পরে এসেছেন।

আমাকে দেখে সমস্ত পশুপাখী আনন্দে এক সঙ্গে নিজ নিজ জাতীয় ডাক ডেকে উঠেই থেমে গেলেন এবং তাঁদের তখনকার প্রধান আকর্ষণের দিকে মন দিলেন। ওঁরা আগে থাকতেই পরামর্শ করে ছিলেন দেশ-বিদেশের ভাইবোনেদের সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে কে জানে, অতএব বিদায় উপলক্ষে একটা মনে রাখবার মতো কিছু করা হোক। ফুটবল খেলাই ঠিক হয়েছিল অনেক আলোচনার পর।

হনুমানের খুব আগ্রহ ছিল এই খেলায়, কিন্তু মুশকিল হল খেলার নিয়ম কারো ঠিক জানা নেই। হনুমান কলকাতার মাঠে একটা গাছে বসে কয়েকদিন এ খেলা দেখেছেন, কিন্তু নিয়মকানুন সব মুখস্থ নেই—মাত্র কিছু কিছু তিনি জানেন। একটা চিল বললেন তিনি অনেক বার ফুটবল খেলা দেখেছেন, দরকার হলে তিনি অ্যাসোসিয়েশনের একখানা রুল বুক ছোঁ মেরে নিয়ে আসতে পারেন কলকাতা থেকে।

সবাই বললেন তার দরকার নেই, মোটামুটি ঠিক হলেই হল। হনুমান যেটুকু জানেন ওঁদের বুঝিয়ে দিলেন। কিন্তু আসল কথাই সবার ভুল হয়ে গেছে, ফুটবলের বল কোথায়?

ভালুক এ সমস্যার সমাধান ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, এ বনে অনেক বাতাপি লেবু আছে, তাই দিয়েই খেলা হোক। কিন্তু তখন উৎসাহ এমন চরমে পৌঁছে গেছে যে খেলা বন্ধ করবার তো আর উপায় ছিল না, তাই বাতাপি লেবুই যথেষ্ট, এমন কি কিছু না হলেও খেলা বন্ধ করা যেত না।

বলের সমস্যা তো কিছুই না, যে সব বড় বড় সমস্যা ওঁদের সমাধান করতে হয়েছে তা শুনলে অবাক হতে হয়। তার একটি হচ্ছে: চার পায়ে খেললে তা মানা হবে কি না, এবং তাতে হ্যাণ্ডবল আদৌ হবে কি না।

আমার উপর বিচারের ভার দিয়েছিলেন ওঁরা, কিন্তু আমি বললাম, "এবারে আমি শুধু নীরব দর্শক, আমি কোনো বিষয়েই কোনো কথা বলব না, আর তাতে আপনাদের ভালই হবে, কেননা আপনারা আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় নামতে যাচ্ছেন, এখানে আপনাদের বুদ্ধিতেই সব সমস্যার সমাধান খুঁজলে ভাল হয়। আমি সব বসে বসে দেখি, দেখা শেষ হলে ফিরে গিয়ে আপনাদের এই খেলার কথা খবরের কাগজে ছাপিয়ে দেব।"

সবারই কথাটা পছন্দ হল। আসলে আমি এসেছিলাম বাঘের কাছে ক্ষমা চাইতে, কিন্তু মনে হচ্ছে তার আর দরকার হবে না, বাঘ আমাকে দেখেই যে আনন্দ প্রকাশ করেছেন তাতে আমি বুঝতে পেরেছি তিনি আমাকে আগেই ক্ষমা করেছেন।

ওঁদের সমস্যা সমাধান ওঁরা নিজেরাই আরম্ভ করলেন। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঠিক হল, শুধু হাতীর হ্যাণ্ডবল হবে যদি তাঁর শুঁড়ে বল লাগে। কারণ শুঁড়ই হচ্ছে হাতীর হাত। হাতী খেলার সময় শুঁড়টিকে জড়িয়ে মাথার উপর রাখবেন।

তারপর দল ভাগের সমস্যা। প্রথমে ঠিক হল ভারতীয় ও অভারতীয়, এই দুই দল হবে। এবং জোড় মিলিয়ে খেলোয়াড় দাঁড় করাতে হবে। কিন্তু হিসেব করে দেখা গেল ভারতে ক্যাঙারু নেই এবং তার জুড়িও কেউ নেই, অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে খেলা চলতে পারে না। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলার দেশ থেকে তিনি এসেছেন।

বাঘের জুড়িও মিলল না, অথচ বাঘ একটি বিশিষ্ট খেলোয়াড়। ভারতীয় হাতী, আফ্রিকার হাতী ; ভারতীয় গণ্ডার আফ্রিকার গণ্ডার ; ভারতীয় হনুমান, ইণ্ডোনেশিয়ার ওরাঙ উটান, ভারতীয় সিংহ আফ্রিকার সিংহ ইত্যাদি সব জোড় মেলে, মেলে না শুধু ঐ দুজনের। অবশেষে ঠিক হল ভারতের দিকে থাকবেন হনুমান, গণ্ডার, হাতী, চিতা ইত্যাদি অন্যদিকে থাকবেন মিশ্র পশুরা। ভারতীয়দের গোল রক্ষক থাকবেন হনুমান। ইংল্যাণ্ড থেকে শেয়াল এসেছিলেন, তিনি

দুই দলের নাম ঠিক করে দিলেন—ফরেন মিক্সড ভার্সাস ইণ্ডিয়ান ইলেভেন। বাঘ খুশি হলেন এবং বললেন, “আমাদেরও দলকে

ইণ্ডিয়ান মিক্সড বলা যেত, যদি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের একজন ক'রে

নেওয়া সম্ভব হত কিন্তু তা তো আর হল না। সিংহ চিতা ও আমি এক গোষ্ঠীর প্রাণী, Felis গোষ্ঠীর। সিংহ Felis leo, বাঘ Felis tigris, চিতা felis pardus। সব বিড়ালের জ্ঞাতি।"

পরের সমস্যা রেফারির। কে হবে রেফারি? জিরাফ বললেন, "আমি চেষ্টা করতে পারি, আমার গলা লম্বা, সবটা মাঠ এক সঙ্গে দেখতে পাব, আমাকে বাঁশি দাও।"

জিরাফের কথা বলা শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি জানতাম ওঁরা কথা বলতে পারেন না। সেজন্য একটুখানি বিস্ময় রয়ে গেল মনে। মনের মধ্যে একটা সন্দেহ কাঁটার মতো বিঁধে রইল।

বাঁশির কথায় সবারই খেয়াল হল তাই তো বাঁশি কোথায়? ময়াল সাপ লজ্জায় জিভ কাটলেন। বানর বললেন, "কোনো ভাবনা নেই আমি ব্যবস্থা করছি।" বানর চট ক'রে নারকেল পাতা ছিঁড়ে তা থেকে সুন্দর একটা বাঁশি বানিয়ে দিলেন। জিরাফ সেটি মুখে দিয়ে বাজিয়ে দেখলেন ঠিক আছে। কিন্তু মিনিটখানেকের মধ্যেই জিরাফের মুখে আর বাঁশি দেখা গেল না।

সিংহ অধীরভাবে বলে উঠলেন, "বাঁশি কোথায়!"

জিরাফ ভয়ে ভয়ে বললেন, "ভুল ক'রে খেয়ে ফেলেছি।" এবং তার জন্য লজ্জায় ঘাড় হেঁট করতে গিয়ে পারলেন না। ঘাড় হেঁট করতে হলে জিরাফ বড়ই বিপদে পড়েন। তাঁর সামনের দুখানা পা দুদিকে অনেকখানি ছড়িয়ে না দিলে ঘাড় নিচু হয় না। কিন্তু সেই ভিড়ে পা ফাঁক করবার জায়গা ছিল না।

জিরাফের উপর যে বিশ্বাস ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। এত লোভ যার তাঁকে রেফারির পদ দেওয়া যায় না। খেলা থেকেও তাঁকে বাদ দেওয়া হল।

রেফারি হলেন ওরাঙ-উটান।

বিদেশীদের খেলোয়াড়দের অবস্থান হল এই রকম—
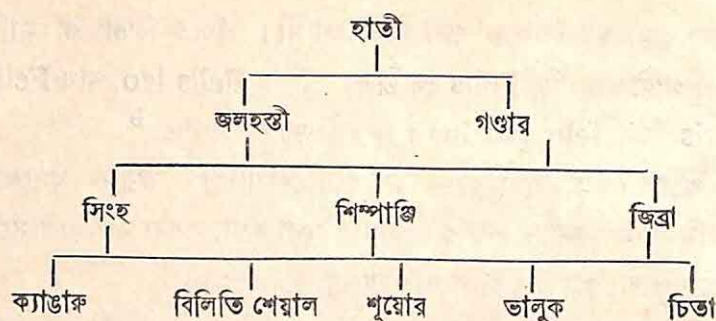
হাতী গোলরক্ষক হওয়াতে হ্যাণ্ডবল হওয়ার প্রশ্ন আর রইল না।

সব ঠিক্ এমন সময় চিল হঠাৎ ট্যাঁ ট্যাঁ ক'রে উঠলেন। তিনি বললেন, বন্ধুগণ একটি অতি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে।

সবাই চমকে গেলেন এ কথা শুনে। চিল বললেন, "আগে মনে ছিল না, এখন মনে পড়ল হঠাৎ। ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের একটি নিয়ম আছে, বল হাতে লাগলে হ্যাণ্ডবল নামক অপরাধ হয়।"

তিনচার জন জন্তু প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলেন, "ও কথার মীমাংসা তো হয়ে গেছে, আবার কেন?"

চিল বললেন, "বানর জাতীয়দের কথা ভাবা হয়নি।"

"কেন, ওরা তো হাতে বল ছোঁবে না কথা হয়েছে, শুধু পায়েই খেলবে।"

চিল বললেন, "ওদের যে পা-ই নেই।"

সবাই আবার হৈহৈ ক'রে উঠলেন।

চিল বললেন, "আমি খাঁটি কথাই বলেছি। ওদের চারখানাই হাত। শিম্পাঞ্জি, হনুমান, আর এদের জ্ঞাতিগুষ্টি সবারই চারখানা ক'রে হাত, পা একটিও নেই। চারখানা হাতই ওদের সমান কাজে লাগে, একেবারে সমচতুর্ভুজ ওরা। যাকে ওরা পা ব'লে চালাচ্ছে, তা পা নয়, হাতের মতোই ডালপালা ধরার কাজে ব্যবহার করে।" সবাই স্তম্ভিত হলেন এ কথা শুনে। বললেন, "ওদের পা দুখানা যে পা নয়, তার আর কোনো প্রমাণ আছে?"

চিল বললেন, "চোখে দেখা ভিন্ন আপাতত আর কিছু নেই। তবে যদি আমাদের অতিথি মানুষটি কিছু বলেন।"

আমি বললাম, "আজকের দিনে আমি কিছু বলব না, আগেই বলেছি। বাইরের লোকের মীমাংসা এত সহজে নিতে নেই।"

বাঘ বললেন, "তবে থাক, বিশ্বাস ক'রে নিলাম কথাটা। কিন্তু ওদের বাদ দিলে ওদের জায়গায় কে দাঁড়াবে?"

চিল বললেন, "সহজ মীমাংসা আছে। শিম্পাঞ্জির জায়গায় জিরাফকে দাঁড় করিয়ে দিন। জিরাফ বল হেড করতে পারবে খুব চমৎকার।"

তাই ঠিক হল। ইউনিফর্ম পরার কথা উঠেছিল, কিন্তু তার কোনো দরকার হল না, কারণ দু পক্ষেরই খেলোয়াড় ভিন্ন জাতের, ভিন্ন দেশের, তাই চিনতে অসুবিধে হবে না।

ক্যাঙারু হলেন রেফারি, শুধু তাঁকে একটি হাফপ্যান্ট পরিয়ে দেওয়া হল।

কিন্তু আবার এক নতুন বাধা। এক ঝাঁক ভ্রমর খুব সন্দেহজনকভাবে রেফারির মাথার চারদিকে ভীষণ জোরে গুন্‌গুন্ আওয়াজ করতে লাগলেন, ওঁরা এক সঙ্গে এসেছেন প্রায় হাজার খানেক। রেফারি একটু ভড়কে গেলেন ওঁদের দেখে, বেচারা বিদেশী ক্যাঙারু, এদেশের হালচাল কিছুই জানেন না।

মোড়ল ভ্রমর জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমাদের ক্যাপটেন কে?"

এই প্রশ্নে সবাই পরস্পরের মুখের দিকে চাইতে লাগলেন। তাই তো, ক্যাপটেন তো কোনো দিকেই নেই! তখন সিংহ এগিয়ে এসে বললেন, "কি বলবে, আমাকে বল।"

ভ্রমর জিজ্ঞাসা করলেন, "রেফারি মানে কি?"

সিংহ বললেন, "তা দিয়ে তোমার কাজ কি, বাপু?"

এক পণ্ডিত ভ্রমর এগিয়ে এসে বললেন, "কাজ আছে বৈ কি। 'রেফারি' সন্ধি বিচ্ছেদ করলে হয় 'রেফ+অরি।' তার মানে রেফের

শত্রু। আর আমাদের নাম হচ্ছে দ্বিরেফ। দ্বিরেফ মানে ভ্রমর। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে তোমাদের রেফারি মানে দ্বিরেফারি; তাই আমাদের সন্দেহ হচ্ছে তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছ।"

সিংহ বাংলাদেশের পণ্ডিত শেয়ালের দিকে তাকিয়ে বললেন, "পণ্ডিত, তুমি এর ব্যাখ্যা কর। রেফারি মানে কি ভ্রমরদের শত্রু?"

বঙ্গীয় শেয়াল মাথা চুলকোতে লাগলেন! ইংল্যাণ্ডের শেয়াল কাছেই ছিলেন, তিনি তো প্রশ্নটা শুনে খুব একচোট হেসে—হাঃ হাঃ হুয়া হুয়া! তারপর বললেন, "ওহে ভ্রমরপণ্ডিত, রেফারি ইংরেজী কথা, ওর উৎপত্তি ল্যাটিন থেকে, কিন্তু থাক সে কথা। রেফারির ইংরেজী বানান হচ্ছে referee, এর সন্ধি বিচ্ছেদ হয় না। অতএব তোমরা নিশ্চিন্ত থাক।"

পণ্ডিত ভ্রমর এই ব্যাখ্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে বললেন, "বেশ, কথাটা মেনে নিলাম, কিন্তু দেখো যেন ধাপ্পা-টাপ্পা না হয়।"

ইতিমধ্যে অন্য ভ্রমররা একটা গাছের ডালে বসে তাঁদের হুলগুলো সব ধারালো ক'রে নিচ্ছিলেন, মোড়ল ভ্রমরের ইঙ্গিত পেয়ে তাঁরা সবাই উড়ে চলে গেলেন।

খেলা আরম্ভ হয়ে গেল। দর্শকদের কি উল্লাস! ভারতীয়দের দিকেই সমর্থন বেশি। কেন বেশি তা তো সহজেই বোঝা যায়। বলটা গোলের কাছাকাছি যায় আর 'গোল, গোল হালুম হুলুম, গাঁ গাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ' শব্দে স্থন্দরবন মুখরিত হয়ে ওঠে। বল পাঁচ মিনিট পর পর ফাটছে আর নতুন বলের যোগান দিচ্ছেন ভালুক। ভারতীয়রা প্রায় দশ মিনিট ধ'রে চেপে রেখেছেন বিদেশীদের, এমন সময় বাঁশি বেজে উঠল। কি ব্যাপার, না ভারতীয় চিতা অফ-সাইড ক'রে বসেছে। সেণ্টার থেকে বাঘ বল পাস ক'রে বাঁ ধারে হরিণকে দিয়েছিলেন ঠিক কিন্তু ফরওয়ার্ড সেণ্টারের চিতা বেগ সামলাতে না পেরে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল তার আগেই। ভারতীয়দের গোল গোল চীৎকার থেমে গেল হঠাৎ। তাঁরা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে লাগলেন। উগ্র সমর্থকেরা

জিভ চাটতে লাগলেন, হাত পা কামড়াতে লাগলেন, লেজ ঘুরিয়ে মুখের কাছে নিয়ে কামড়াতে লাগলেন।

দর্শকের জন্য তো আর গ্যালারি ছিল না, তাই যার যার যেখানে সুবিধে ব'সে গেছেন। হনুমান, ছোট বানর, চিতা, সাপ আর পাখীরা সবাই গাছের ডাল আশ্রয় করেছেন, (কলকাতাতেও এমন হয়)। বাঘ, সিংহ, শেয়াল, জলহস্তী, গণ্ডার, জিরাফ, জিব্রা, হাতী— এঁরা সব মাটিতে দাঁড়িয়ে গেছেন। জিরাফের মাথায় গোটাকত পাখী আশ্রয় নিয়েছেন। জলহস্তী একবার গাছে ওঠার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সবাই হেসে ওঠাতে তিনি ও চেষ্টা আর করেননি।

আবার আরম্ভ হল খেলা। দু তিন মিনিট পরপরই বল ফেটে যাচ্ছে, আবার নতুন বলের যোগান দেওয়া হচ্ছে, লাইনসম্যানের কাজ করছেন বানরেরা। এই বার ভাগ্য ফিরল বিদেশীদের। রুশ ভালুক বল নিয়ে যেন ভেল্কি খেলছেন, এর উপর ক্যাঙারুর লাফ, বিলিতি শেয়ালের ধূর্ততা আর আফ্রিকার চিতার বিদ্যুৎগতি দৌড়। এদিকের খেলোয়াড়েরা ঘেমে উঠেছেন, হাঁফাচ্ছেন। ক্যাঙারু খুব জব্দ করছেন এঁদের। নিজেই বল এগিয়ে দিয়ে নিজেই লাফিয়ে গিয়ে ধরছেন। গোল হয় হয়, ভারতীয় উগ্র সমর্থকদের সুর নরম হয়ে এসেছে, এমন সময় বাজল বাঁশি। কি ব্যাপার? না ভারতীয় দলের ফাউল হয়েছে পেনালটি সীমার মধ্যে! হায় হায় কি সর্বনাশ! তার মানে ভারতীয় দলের গোল খাওয়া এবারে কে ঠেকায়।

ঘটনাটা ঘটেছে এই : ক্যাঙারু যখন যমের মতো এগিয়ে এসেছেন গোলের কাছে আফ্রিকার চিতার কাছে বল পাস্ ক'রে দিতে যাচ্ছেন, এমন সময় ভারতীয় চিতা হাফ-ব্যাক (হাফ-বাঘও বটে), তাঁর লেজটি ক্যাঙারুর পায়ে জড়িয়ে তাঁকে চিৎ ক'রে ফেলেছেন। নির্ঘাত ফাউল।

আন্তর্জাতিক দর্শকেরা আনন্দে হৈহৈ করতে আরম্ভ করেছেন, ভারতীয় দর্শকদের মুখ শুকিয়ে গেছে, কয়েকটি হনুমান, চিতা ও একটি

ময়াল সাপ মূর্ছিত হয়ে গাছ থেকে নিচে প'ড়ে গেলেন। কিন্তু এমন উত্তেজনার সময় কে তাঁদের ফার্স্ট এড দেবেন!

ওদিকে ভারতীয় উগ্র সমর্থকদের মধ্যে চট ক'রে কি একটা

গোপন পরামর্শ হল, আর সঙ্গে সঙ্গে তারা গর্জন করতে করতে দর্শক-দের সীমানা পার হয়ে ছুটে এলেন রেফারির দিকে এবং এসেই তাঁর

উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। অন্যরা চেঁচাতে লাগলেন, "ফাউল হয় নি, ফাউল হয় নি, অ্যাসোসিয়েশনের রুল বুকে লেজের বিরুদ্ধে কোনো আইন নেই, আমরা মানব না এ আইন।"

ততক্ষণে রেফারি ক্যাঙারুর অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে উঠেছে। অতগুলো বাঘের ময়াল সাপের সিংহের আর অন্যান্য অনেক রকম মোটা মোটা প্রাণীর চাপে প্রাণ যায়। এমন সময় হঠাৎ ক্যাঙারুর একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। ঘটনাটি ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে। সেখানে এক চোরের উপর অনেকগুলো মানুষ চেপে পড়েছিল। চোরের প্রাণ যায়, এমন সময় সে গেয়ে উঠল, 'গড সেভ দি কিং।' এটা তাদের জাতীয় সঙ্গীত। এ সঙ্গীত শুনলেই উঠে দাঁড়াতে হয়। চোর এই উপস্থিত বুদ্ধিতে বেঁচে গিয়েছিল। ক্যাঙারুরও এখন বাঁচবার ঐ একমাত্র উপায়, অতএব পরীক্ষা ক'রে দেখতে বাধা কি? তিনি চাপের নিচে থেকে চাপা গলায় বাংলায় গেয়ে উঠলেন, 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা, পঞ্জাব সিন্ধু'— ইত্যাদি।

আশ্চর্য ফল ফলল। ভারতীয় পশুরা এ গান শুনে উঠে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন।

এর কিছুক্ষণের মধ্যেই বিদেশীরা একত্র হয়ে আলোচনা করতে লাগলেন নিজেদের মধ্যে। তাঁরা বললেন এ রকম তো কোনো দেশে হয় না, ফুটবল খেলায় রেফারির উপর এরকম আক্রমণ তাঁরা কোথায়ও দেখেননি। ওরাঙ-উটান বললেন, "বুঝতে পারছি ভারতের এটা বড় খারাপ সময় চলেছে, এ সবই দুর্নীতির ফল।" তারপর তিনি ইংল্যাণ্ডের শেয়ালের দিকে চেয়ে বললেন, "আর এটি তোমাদেরই কীর্তি, তোমরা যারা এতদিন এ দেশ দখল ক'রে ছিলে। আফ্রিকাতেও আমাদের অবস্থা তোমরাই খারাপ করেছ। অতএব ভাই সব, নিন্দা ক'রে লাভ নেই, আমরা পরস্পর দূরে আছি, তাই কেউ কাউকে চিনি না, কেউ কাউকে ভালবাসি না।"

ক্যাঙারু জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করলে দেশে দেশে বন্ধুত্ব হতে পারে?"

জলহস্তী বললেন, "বোধ হয় সংস্কৃতি বিনিময়ে হতে পারে।"

ওরাঙ-উটান বললেন, "ঠিক। চল আমরা এ বিষয়ে পরামর্শ করি গে।"

আমি এসব থেকে একটু দূরে সরে গেলাম। এবারে এঁদের কোনো আলোচনাতেই, আমি থাকব না ঠিক করেছিলাম তাই জঙ্গলের ভিতরের দিকে গিয়ে বিশ্রাম করেছিলাম। আমার থেকে একটু দূরে ঠাণ্ডা-মাথা দুটো বুড়ো বাঘও ভিড় থেকে সরে এসে খুব দুঃখিতভাবে বসেছিলেন। বিদেশীদের কাছে তাঁরা মুখ দেখাতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। আমি শুনতে পেলাম, তাঁদের একজন আর একজনকে বলছেন, "কি জানি ভাই খেলার নিয়ম তো জানি না।"

একটা হনুমান তাঁদের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন, উত্তরপ্রদেশের হনুমান তিনি। বাঘ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভাই, তুমি বলতো, রেফারির উপর ঝাঁপিয়ে পড়া কি ন্যায্য হয়েছে?"

হনুমান ভাঙা বাংলায় বললেন, "আরে মোসা, কলকাত্তার মাঠে রেফ্রির উপর হামলা চালানোই তো দস্তুর মনে হয়। এতে খুব মজা হয়, মোসা। আখেরে রেফ্রিকে মারা বোধহয় ইসোসিয়েসন থেকে পাস হোয়ে যাবে।" বলে হনুমান চলে গেলেন।

ওদিকে সবার মধ্যে আবার উল্লাস জেগে উঠেছে, শুনতে পাচ্ছিলাম দূর থেকেই। শুনে বেরিয়ে এলাম আড়াল থেকে। এসে দেখি ওঁদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেছে। খেলা আর চালানো হবে না ঠিক হয়েছে, কারণ খেলার চেয়ে বড় জিনিসের ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ভারতীয় গাধা প্রস্তাব করেছেন, "এবার থেকে সংস্কৃতি বিনিময় চলবে একদেশের সঙ্গে আর এক দেশের।"

আফ্রিকার জলহস্তী প্রস্তাব করেছেন, "আগামী বারে ভারতীয় পশুপাখীদের আমরা আফ্রিকায় নিমন্ত্রণ করছি।"

আফ্রিকার সবাই এ প্রস্তাব সমর্থন করাতে সবাই হর্ষ প্রকাশ করলেন।

মোটামুটিভাবে ঠিক হল তারপর আফ্রিকার সবাই আসবেন ভারতে। তারপর ভারতীয়রা যাবেন রুশ দেশে। তারপর আরও কোন্ দেশে কে যাবেন প্রস্তাব হল, তা আমার আর মনে নেই তবে আফ্রিকায় যাবার সময় ভারতীয় পশুপাখীদের নেতা আমাকেই হতে হবে এ প্রস্তাবে আমাকে রাজি হতেই হল।

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতীয় পশুপাখীদের সাংস্কৃতিক অভিযান

আফ্রিকার যাবার জন্য খুব উৎসাহ জেগে উঠল সবার মধ্যে। কেউ দেরি করতে রাজি নন, তাই সুন্দরবনের উৎসবের দুমাস পরেই যাওয়া হবে ঠিক হয়ে গেল।

গ্রীষ্মকাল, আফ্রিকাতে তখন ভীষণ গরম, কিন্তু এদিকের উৎসাহের গরম আরও বেশি। ভারতীয় এক ভালুক এ জন্য বড়ই মনমরা হয়ে রইলেন, কারণ জন্ম থেকে তিনি সারা গায়ে-জড়ানো যে কম্বলটি পেয়েছেন, তা নিয়ে সেই গরমে তাঁর পক্ষে আফ্রিকার কিলিমানজারো পর্বতের পায়ের কাছে যাওয়া অসম্ভব। জায়গাটা টাঙ্গানাইকায়, বিষুবরেখার প্রায় উপরে। তাই ভালুক গোপনে বসে কাঁদতে লাগলেন। তারপর বিজ্ঞাপন দেখে কত যে লোমনাশক সাবান গায়ে ঘষলেন তার সীমা নেই। কিন্তু কোনো ফল হল না।

কিন্তু অভিযান সফল হলেও শেষকালে সেই টাঙ্গানাইকার জঙ্গলে যে কাণ্ডটা ঘটে গেল তাতে ক্ষুব্ধ ভালুকটি হিমালয়ের জঙ্গলে বসেই আপন অদৃষ্টকে পরে ধন্যবাদ দিয়েছেন এবং ঘটনাটি অত্যন্ত দুঃখের হওয়া সত্ত্বেও এখন তিনি থেকে থেকে খিকখিক ক'রে হাসছেন। এ হাসি তাঁর অনেকেই দেখেছে।

কিন্তু এখন সে কথা থাক।

ওঁদের অভিযাত্রী দল গঠন করা হল ওইভাবে পশ্চিম ভারতের দুটি সিংহ, বাংলার দশটি টাইগার, বিহারের পঞ্চাশটি চিতা, আসামের দুটি গণ্ডার, কাশীর দু ডজন বানর, লক্ষ্ণৌয়ের দশটি হনুমান, গঙ্গার একটি কুমীর, মধ্যপ্রদেশের পনেরোটি শেয়াল, দিল্লীর দুটি উট

(আসলে আরব দেশের ও ডমিসাইলড), পাঁচটি কলকাতার গাধা এবং বহু কোকিল আর ময়ুর। হাতীকে বাদ দেওয়া হল কারণ ওজন বেশি হওয়াতে এয়ারপ্লেনে যাওয়া সম্ভব নয়। যদিও বা ছোট হাতী একটা নেওয়া সম্ভব ছিল, কিন্তু তা হলে দুটি গণ্ডারকে বাদ দিতে হয়। গণ্ডার দুটি এ প্রস্তাব শুনে হাতীর কাছে গিয়ে তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন। হাতী বললেন, "তুরাই যা, আমি যামু না।"

কিছুদিন থেকে ভারত সরকার বিদেশে সাংস্কৃতিক অভিযান পাঠানোয় খুবই উৎসাহ দেখাচ্ছেন, তাই অনুমতি পেতে দেরি হল না। ভারত সরকার থেকে একখানা স্পেশাল বিমান এঁদের দেওয়া হল, পাসপোর্ট মিলল এক দিনে।

বিমানে সবাই বেশ আরাম করেই বসলেন, কিন্তু মুশকিল বাধল কুমীরকে নিয়ে। আসনে বসতে গেলে প্রকাণ্ড ল্যাজে আটকায়, মাঝামাঝি জায়গায় মেঝেতে পড়ে থাকলে পথ বন্ধ হয়। আর তাতে এয়ার হোস্টেসের অসুবিধে হয় সব চেয়ে বেশি। এয়ার হোস্টেস মানে যাত্রীদের দেখা শোনা যিনি করেন, সেই দিদিমণি।

কিন্তু এখন উপায় কি? কুমীর না গেলে ভারতীয় অভিযানের একটি জলীয় অঙ্গই বাদ পড়ে যায় যে! জলীয় প্রতিনিধি একমাত্র কুমীর। চোখের জল ফেলতেও কুমীরই ভরসা। সভাপতির অভিভাষণে কাঁদার দরকার হলে কুমীরের চেয়ে ভাল আর কাকে পাওয়া যাবে?

সমাধান অবশেষে একটি হয়ে গেল।

ঠিক হল কুমীরকে বিমানের পেটের সঙ্গে কাছি দিয়ে বেঁধে ঝুলিয়ে নেওয়া হবে। বিমানের দুখানা পাখার ঠিক মাঝখানে, নিচের দিকে। দেখাবে ঠিক যেন একটি টর্পীডো ঝুলছে।

আসনটি সবার পায়ের নিচে হওয়া সত্ত্বেও কুমীর নিজে এ ব্যবস্থায় খুব খুশি হলেন। তিনি খোলা হাওয়ায় সব দেখতে দেখতে যেতে পারবেন। মনে তাঁর তখন খুব উৎসাহ, গুন্‌গুন্ ক'রে গাইতেও

লাগলেন, "তোমার খোলা হাওয়া লাগিয়ে পালে, টুকরো ক'রে কাছি, আমি ডুবতে রাজি আছি—"।

বেশির ভাগ সময় কুমীর জলে থাকেন, কদাচিৎ জলের ধারে ডাঙায় ওঠেন, সেজন্য ভূগোলের জ্ঞান তাঁর অতি কম। এইবার বিমানে যেতে যেতে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান তাঁর হবে। কিন্তু যখন সত্যিই বিমান আকাশ পথে উড়ে চলল, তখন ভূগোল তাঁর কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল, বিস্তীর্ণ আকাশের মাঝখানে শূন্যপথে উড়ে চলার এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। নিচে সীমাহীন আরব সাগর, সম্মুখে যতদূর দেখা যায় আকাশ আর জল দূর দিগন্তে এক হয়ে মিলেছে। নিজেকে কত ছোট মনে হচ্ছে তাঁর। তিনি যে আর সব যাত্রীর নিচে আছেন এতে তাঁর খুব ভালই লাগছে। নিচে থাকা তো অগৌরবের নয়, এটাই তো সৌভাগ্য, এবং এ কথা মনে হতেই কুমীরের মনে একটা আধ্যাত্মিক ভাব জেগে উঠল। বিমানের দারুণ শব্দের সঙ্গে সুর মিলিয়ে কুমীর গান ধরে দিলেন—

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে।"

অবশেষে আফ্রিকা!

টাঙ্গানাইকার কোনো এক গভীর জঙ্গলে এঁদের পরস্পর মেলা-মেশা ও সংস্কৃতি বিনিময়ের জন্য জায়গা ঠিক হয়েছিল ওখানকার সবচেয়ে উঁচু পর্বত কিলিমানজারোর কাছের এক জঙ্গলে। এ এক আশ্চর্য পর্বত, জোড়া মাথা, কলকাতার জোড়া গীর্জের মতো। এক কালে এটি ছিল আগ্নেয়গিরি। ১৯ হাজার ফুটের বেশী উঁচু। এখন আগুন নিবে গেছে, এখন সেখানে বরফ। বিষুবরেখার এত কাছে বরফ ঢাকা পর্বতের চূড়া পৃথিবীতে আর নেই। ওখানকার বরফের কি মজা! বেশ গরমে থাকতে পারে।

ওঁদের স্থান নির্বাচন বেশ ভালই হয়েছিল। ভারতীয় প্রাণীরা

এখানে এসে খুব খুশি। তাঁরা আফ্রিকার প্রাণীদের সঙ্গে কোলাকুলি ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কচি ঘাসের অভাব ছিল না, গাধা ও গণ্ডারের সে দৃশ্যে চোখ জুড়িয়ে গেল। কোকিলরা আবহাওয়া দেখে প্রথমে একটু দমে গিয়েছিলেন, কিন্তু কিলিমানজারোর দিকে চেয়ে মনে মনে খুশি হয়ে উঠলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে পর্বতের উচ্চতা মাপতে উপরের দিকে উড়ে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই উপর থেকে কুহু কহু ধ্বনি শোনা যেতে লাগল। ময়ূর হেসে বললেন, "ওরা উপরে উঠেই বাংলার বসন্তের আবহাওয়া পেয়ে গেছে!"

পশুপাখীদের বিষয়ে একটা কথা অনেকের জানা নেই। ওঁরা নানা দেশে থাকেন, সেজন্য ওঁদের আচার ব্যবহারে কিছু কিছু সেই সব দেশের ছাপ পড়ে। কিন্তু ওঁদের এক একটা জাতি নানা দেশে ছড়িয়ে থাকলেও ভিতরে ভিতরে সবাই এক। শুধু ভালুকের গানে এর ব্যতিক্রম দেখেছি। ওঁরা যে গান গেয়ে থাকেন তার সুর ইউরোপীয়। আমি নিজে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় ভালুকের গান শুনেছি। খাঁটি ইউরোপীয় সুর। দূর থেকে খিচুড়ির বালতি দেখলে ওঁরা রোজ গান গেয়ে ওঠেন।

অন্যান্য পশুরা সব এবারে এই সাংস্কৃতিক অভিযান উপলক্ষে পরস্পর পরিচিত হতে পারবেন মনে ক'রে খুশি হয়ে উঠেছেন। তবে গণ্ডারদের একটুখানি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। আফ্রিকার গণ্ডারের সঙ্গে ভারতীয় গণ্ডারের দেখা হতেই ওঁরা প্রথমে ভেবেছিলেন বুঝি লড়াই করতে হবে। গায়ে ওঁদের সব সময়েই বর্ম আঁটা থাকে, তাই সব সময় একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ভাব। চোখেও ওঁরা একটু কম দেখেন। এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু কি ক'রে হঠাৎ ওঁদের মনে প'ড়ে গেল এটি সাংস্কৃতিক সম্মেলন, তাই দুপক্ষেই একটু মুচকি হেসে দূরে স'রে গেলেন।

অধিবেশন যথাসময়ে আরম্ভ হল। ভারতীয় দলের মুখপাত্র হনুমান বললেন আমরা আগে আমাদের পরম বন্ধু আফ্রিকার পশুপাখীদের

কথা শুনতে চাই, কারণ আমার সামান্য বুদ্ধিতে যা ধারণা হয়েছে, তাতে মনে হচ্ছে, আফ্রিকার পশুপাখীরা আমাদের চেয়ে অনেক ভাল। তাঁদের তুলনায় আমরা কিছুই না। আমাদের কথা পাঁচজনকে শোনাবার মতো নয়।

হনুমান ঠিক ভারতীয় রীতিতেই বিনয় প্রকাশ করলেন এইভাবে। কিন্তু আফ্রিকার দিকেও বিনয় ছিল। তাঁরা সবাই প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠলেন, সে কথা আমরা মরে গেলেও মানতে পারব না। আমাদের বিশ্বাস, ভারতীয় পশুপাখীরা আমাদের চেয়ে ভাল।

ভারতীয়রা এ কথা মানলেন না। তাঁরা বললেন, ওটা একটা কাজের কথাই নয়।

কিন্তু এভাবে অকারণ সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে আমাকেই অগত্যা উঠে দাঁড়াতে হল। আমি বললাম, আপনারা সবাই জ্ঞাতিগুষ্টি, আমাদের এভাবে তর্ক করা ভাল দেখায় না। আপনারা চরিত্রে ব্যবহারে সবাই এক, তবে অনেক দিন আলাদা থেকে নিজেদের সম্বন্ধে অনেক কথা আপনারা ভুলে গিয়েছেন। যেমন ধরুন ভারতীয় সিংহ ভারতে বাস ক'রে প্রায় কেশরশূন্য হয়েছেন, তাই তাঁরা ভাবছেন আফ্রিকার সিংহ থেকে তাঁরা হীন। অথচ এক ভারতীয় সিংহকে একদা লণ্ডন পশুশালায় রাখার পর তাঁর কেশর গজিয়েছিল। আবার দেখুন মানুষদের মাথায় বিলেতে হোক, ভারতে হোক, সমান টাক পড়ে। আরও শুনে অবাক হবেন যে এককালে—সে অনেক কাল আগে সব সিংহই ছিলেন ইউরোপীয়, খাঁটি আর্য। কিন্তু 'সভ্য' হিংস্র মানুষের সঙ্গে এঁদের পোষাবে না মনে ক'রে এঁদের প্রায় সবাই আফ্রিকায় চলে এসেছেন। সিংহের ভাষায় কেউ পণ্ডিত থাকলে তিনি দেখাতে পারতেন, আফ্রিকার সিংহ যে গর্জন করেন, তার মধ্যে টুকরো টুকরো ইণ্ডো-ইউরোপীয় ভাষার গন্ধ এখনও পাওয়া যায়। কিছু সংস্কৃত ভাষা, কিছু গ্রীক ভাষা, কিছু ল্যাটিন ভাষা গুঁড়ো ক'রে একত্র মিশিয়ে বোমা তৈরি করুন, এবং তা ফাটান, দেখবেন সেটাই হবে অবিকল

সিংহ গর্জন। তা হলে বুঝে দেখুন, আপনারা পূর্বে এক দেশে এক সংস্কৃতির আওতায় বাস করতেন। আপনাদের মধ্যে আরো একটি সামাজিক প্রথা আছে, সেটি সবদেশের সিংহের বেলাতেই এক। যেমন ধরুন, আপনাদের আইনে একটি থেকে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারা যায়, এবং বিবাহ-বিচ্ছেদ চলে না। সব দেশের সিংহের এই একই নিয়ম। তবু সিংহেরা অনেকেই একটি বা দুটির বেশি বিয়ে করতে পারেন না, কারণ সন্তান পালনের ভার বাপকেই নিতে হয়, এবং তিন বছরের জন্য। খরচ পোষায় না।

এ কথায় সিংহেরা খুব খুশি হয়ে উঠলেন। এবং ভারতীয় দুটি সিংহকে আফ্রিকার সিংহেরা জড়িয়ে ধরে একে একে হঠাৎ এমন আদর করতে আরম্ভ করলেন যে ভারতীয় সিংহ দুটির প্রাণ যায় আর কি। এমন আত্মীয়, অথচ বিদেশে থাকায় সব ভুল হয়ে গিয়েছিল, এতদিন পরে তার প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হল। আফ্রিকার সিংহরা এক এক ক'রে আসেন, ভারতীয় সিংহদের জড়িয়ে ধরেন, ওদের সঙ্গে কোলাকুলি করেন, এবং মুখে চুমো খান ; এমনি চলল প্রায় ঘণ্টাখানেক। পশু-রাজদের রাজকীয় ব্যাপার, কারো কিছু বলবার উপায় নেই।

আমার বক্তৃতা আগেই থামিয়ে দিয়েছিলাম।

বিরাট সাংস্কৃতিক সভা। আফ্রিকার তিন রকমের সিংহ, হাতী, জিরাফ, জলহস্তী, জিব্রা, গণ্ডার, কুমীর, সাপ, লেপার্ড, হায়েনা, শিম্পাঞ্জি, হরিণ, উট—কত যে এসেছে তার সংখ্যা নেই। শুধু কয়েকটি বন্য উট দূর থেকে চোখে দূরবীন লাগিয়ে এঁদের উৎসব দেখছিলেন, তাঁরা বিশেষ কারণে সভায় উপস্থিত থাকতে পারেন নি। বিশেষ কারণটা আর কিছুই না, একটি মোড়ল উট তাঁদের দলের আর কয়েকটি উটের উপর বর্বর আক্রমণ চালিয়ে দুটিকে একেবারে মেরে ফেলেছেন, তাঁদের আজ শ্রাদ্ধ, তাই সভায় না এসে দূর থেকে দেখার ব্যবস্থা করেছিলেন।

সভায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোরিলা। তিনি প্রথমে তাঁর

লিখিত অভিভাষণ পাঠ করলেন। তিনি বললেন, আমি আজ আফ্রিকার সকল পশুপাখীদের পক্ষ থেকে ভারতীয় পশুপাখীদের সাদর অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। তাঁদের নেতা মানুষটিকেও জানাচ্ছি। আমি একটি মাত্র কথা বলব। আপনারা আজকের সম্মেলনকে শুধু সংস্কৃতির নয়, আফ্রিকার বান্দুং সম্মেলন বলেও গণ্য করুন, এবং সকলের শান্তি পূর্ণ সহ অস্তিত্ব স্বীকার করুন। জয় পঞ্চশীলের।

এই কথাটি উচ্চারণ করা মাত্র সভায় এক তুমুল আনন্দ কোলাহল আরম্ভ হল। সিংহ বাঘ হাতী বানর গাধা আর অন্যান্য পশুপাখীদের মিলিত হর্ষধ্বনি থামতেই দশ মিনিট কেটে গেল।

তারপর গোরিলা বলতে লাগলেন, যে দায়িত্ব আপনারা আমার উপর চাপিয়েছেন, আমি তার যোগ্য নই, কিন্তু তবু যে আমি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হতে রাজি হয়েছি, সে কেবল বিবর্তন পথে বানর জাতির বিশেষ স্থানটি স্মরণ করে। আমরা প্রাণী বিবর্তনের দীর্ঘ পথে পশুত্বের শেষ এবং মনুষ্যত্বের আরম্ভে এসে থেমে আছি। তাই হয়তো পশুপাখীদের মুখপাত্র হওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা নয়। কিন্তু আমার সামনে যে একটি মানবসন্তান উপস্থিত আছেন তিনি যেন আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করেন।

আমি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম গোরিলার ভাষণ, কিন্তু মার্জনার কথায় চমকে উঠলাম। বললাম, আমাকে লজ্জা দেবেন না, ভাই। মানুষের কথা ভুলে, এখন আপনাদের প্রোগ্রাম চালিয়ে যান।

গোরিলার ভাষণ শেষ হয়েছিল তখনই। তার পরেই ময়ূরের নাচ ঘোষণা করা হল। কিন্তু ময়ূরেরা তখন সভায় উপস্থিত ছিলেন না। শোনা গেল তাঁরা বাজার করতে বেরিয়েছেন। কাস্টমস্‌এর মাশুল না দিয়ে তাঁরা অনেক রকম প্রসাধনের জিনিস ভারতে নিয়ে যেতে পারবেন জানতে পেরে তাই কিনতে বেরিয়েছেন এখানে সব অসম্ভব সস্তা। তাঁরা ফিরে এলেন অল্পক্ষণের মধ্যেই, তাঁদের পিছনে এক জিব্রা, জিব্রার পিঠে তাঁদের কেনা সব জিনিসের বোঝা।

ময়ূর নেত্রী বললেন, আশা করি দেরি হয়নি। এখন বোধ হয় আমাদের পালা। তিনি পুরুষ ময়ূরদের পেখম মেলতে আদেশ দিলেন। সভাপতি বললেন, আপনাদেরই পালা, আপনাদের জন্যই অপেক্ষা করছি। তিনি পুনরায় 'ময়ূর নৃত্য' ঘোষণা করলেন।

কিন্তু ভারতীয় ময়ূরেরা নাচতে গিয়ে দেখলেন তাঁদের পাও চলে না, পেখমও খাড়া হয় না। বার বার চেষ্টা করেও ওঁরা নাচতে পারলেন না। লজ্জায় ঘামতে লাগলেন।

তাতে এক মুহূর্তে সব উৎসাহ যেন নিবে গেল। ভারতীয় দল বড়ই অপ্রস্তুত হলেন। কি ব্যাপার? আমি ছুটে গেলাম ময়ূরদের কাছে। ওঁরা আমাকে দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আগে খেয়াল করিনি, দেশে থাকতে আমরা বর্ষায় নাচি। সেও হয়েছে বর্ষার কাব্য পড়ার পর থেকে। বর্ষার সঙ্গে ময়ূরের নাচকে কবিরা এমন গেঁথে ফেলেছেন যে অন্য সময় ক্ষমতা থাকলেও এখন আর নাচতে ইচ্ছে করে না। অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন।

আমি ছোট্ট একটি বক্তৃতা দিয়ে এদের অবস্থা সবাইকে বুঝিয়ে দিলাম। সবাই শুনে আসল ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। ঠিক এমন সময় গাধা এগিয়ে এসে প্রস্তাব করলেন তাঁরা নাচতে পারেন অনুমতি পেলে।

কিন্তু অনুমতি দেওয়া হল না। গাধার শুধু গান গাইবার প্রোগ্রাম আছে, নাচার নেই।

অতএব পরবর্তী বিষয়ে যাওয়া গেল, অর্থাৎ ভারতীয়দের সম্মিলিত গান। গান আরম্ভ হল। এমন অদ্ভুত সুরের মিল আজ পর্যন্ত কোথায়ও দেখা যায়নি। সিংহ, বাঘ, গণ্ডার গাধা কোকিল—সবার সমবেত কণ্ঠ। কি মধুর এবং গম্ভীর। জমি কেঁপে উঠল, বাতাস কাঁপতে লাগল, এবং তার ফলে দেখতে দেখতে আকাশে বর্ষার মেঘ জমে গেল। আর ঠিক। তারই সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরদের পা নেচে উঠল, পালক সব রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল, তাঁদের মুখে বাজতে লাগল আর

সবার সুর ছাপিয়ে ওঠা কেকাধ্বনি। গাধার সুরের সঙ্গে ময়ূরের সুরের পাল্লা চলল, কখনো গাধা জেতেন, কখনো ময়ূর। সিংহরা পরস্পর ফিসফিস করে বলতে লাগলেন, এর পর সিংহের গলার দাম কমে যাবে না কি?

কিন্তু সব চেয়ে মজার কথা এই নাচগানের হল্লার মধ্যেও হঠাৎ ক্যাঁক করে একটি শব্দ হল আফ্রিকার হরিণদের গ্যালারির পিছন দিকে। দূর থেকে আফ্রিকার একটি সিংহ লক্ষ্য করলেন, ভারতীয় একটি শেয়াল উৎসবে যোগ না দিয়ে চোরের মতো ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, এবং সেই শেয়ালই গণ্ডগোলের সুযোগ নিয়ে একটি ছোট্ট গেজেল হরিণের ছানাকে গলা কামড়ে ধরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন।

সিংহ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু নিজেকে সংযত করলেন, এবং ব্যাপারটা চেপে গেলেন! হাজার হলেও অতিথি, সব সময় মাননীয়।

কিন্তু কি অদ্ভুত পরিবেশ! আনন্দময়! আফ্রিকার দর্শকেরা গদ্‌গদ। মুখে একটি কথা নেই। গণ্ডার জলহস্তী, এঁদের দেহ দুলে দুলে উঠছে, হাতীদের কান নাচছে, সিংহদের চোখ বোজা, মুখে মৃদু মৃদু হাসি। কুমীরদের চোখে আনন্দাশ্রু। হরিণেরা তো একেবারে জ্ঞান-হারা।

উৎসব বেশ জমে উঠেছিল, এমন সময় এক দুর্ঘটনা।

আফ্রিকারই একটি ত্রুটির জন্য এমন লজ্জাকর ব্যাপারটা ঘটল। ত্রুটি অবশ্য ইচ্ছাকৃত নয়। কিন্তু সে যাই হোক, এরই জন্য সমস্ত আয়োজন তছনছ হয়ে গেল।

প্রথমে চেঁচিয়ে উঠলেন জলহস্তী। চেঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে, আফ্রিকার সমস্ত পশু এক সঙ্গে আকাশ ফাটানো চিৎকার করতে করতে হঠাৎ ছুটতে আরম্ভ করলেন। সবার মুখে ভয়াবহ আর্তনাদ, রক্ষা কর, রক্ষা কর! সব পশুরা যেন এক সঙ্গে পাগল হয়ে গেছেন। তাঁরা দিগ্-

বিদিক জ্ঞান হারা হয়ে ছুটছেন, তাঁদের চোখ মাথা থেকে যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। তাঁরা এবারে সবাই মিলে চিৎকার করতে লাগলেন —মানিয়ারা! মানিয়ারা! ছুটছেন আর চেঁচাচ্ছেন। মুখে শুধু মানিয়ারা। কাঁটা ঝোপঝাড় অগ্রাহ্য করে, সকল বাধা ভেঙেচুরে, ছুটছেন আর আর্তনাদ করছেন। তারপর ভারতীয় পশুদেরও মুখে আতঙ্ক আর কণ্ঠে ভয়াবহ চিৎকার শোনা গেল। এবং তাঁরাও কোথায় চলেছেন না জেনে প্রাণ বাঁচানোর জন্য আফ্রিকানদের সঙ্গে ছুটতে আরম্ভ করলেন।

ছুটতে ছুটতে তাঁরা এসে পড়লেন মানিয়ারা নামক হ্রদে। এবং এসেই ঘন ঘন ডুবতে লাগলেন এবং শেষে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে শুধু মুখ বিকৃত করতে লাগলেন।

আফ্রিকানরা ভীষণ লজ্জিত হয়ে পড়লেন। ভারতীয়রা দিশাহারা। কিছু বিরক্তও।

আধঘণ্টা পর আস্তে আস্তে উপরে উঠে এলেন সবাই। আমি আগেই সব বুঝতে পেরে একটা গাছে উঠে পড়েছিলাম। বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে গাছ থেকে নেমে খুব সাবধানে পথের দিকে দৃষ্টি রেখে মানিয়ারা হ্রদের দিকে ছুটে এলাম। আমার পিছু পিছু বানরেরাও এলেন, তাঁরাও গাছে উঠেছিলেন। ওঁদের মুখে মানিয়ারা চিৎকার শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম ওঁরা সেখানেই চলেছেন ছুটে।

আমি গিয়ে দেখি জল থেকে ওঠার পর আফ্রিকার একটি সিংহ ভারতীয় একটি সিংহের পা জড়িয়ে ধরে বলছেন, ভাই, ক্ষমা করুন। আমাদেরই দোষ। আমরা পশুপাখীরা মিলেছি, কিন্তু পিঁপড়েদের ডাকিনি, তাই ওরা তার শোধ নিয়েছে।

এই যে হাজার হাজার কীট আক্রমণ করলেন, ওঁরা কোন্ জাতের পিঁপড়ে?—জিজ্ঞাসা করলেন ভারতীয় সিংহ।

আফ্রিকার সিংহ বললেন, ওঁরা আফ্রিকার একজাতীয় পিঁপড়ে, নাম ড্রাইভার অ্যান্ট। এমন হিংস্র কীট পৃথিবীতে মাত্র দু একটি

জায়গায় আর আছেন। ওঁরা আস্ত জীবিত জন্তুকে আক্রমণ করে তাঁর মাংস খান। জলে না ডুবলে বাঁচবার আর কোনো উপায় থাকে না। ভাগ্যিস মানিয়ারা হ্রদ কাছে ছিল, তাই সবাইকে সেই দিকে ছুটতে বলেছিলাম।

ভারতীয় জন্তুরা এবারে সব বুঝতে পারলেন, এবং নিজেদের মধ্যে একটু পরামর্শ করে এসে বললেন আফ্রিকানদের আমরা ক্ষমা করলাম। তবে সংস্কৃতি অভিযানটি এমন মাঝপথে পণ্ড হয়ে যাওয়ার দুঃখ তো আর সহজে ভোলা যায় না, সেটা রয়েই গেল।

আফ্রিকার সিংহ বললেন, এ রকম বাধা সব কাজেই আছে ভাই। বাধা ঠেলে চলা যেমন মনুষ্যত্বের পরিচয়, তেমনি পশুত্বেরও পরিচয়। অতএব দুঃখ না ক'রে আগামী বছরের জন্য আরও ভাল আয়োজন করা যাক।

উত্তম প্রস্তাব। আগামী বছরে ভারতে আফ্রিকানদের সংস্কৃতি-অভিযানে নেমন্তন্ন করা হল। তাঁরাও খুব আনন্দের সঙ্গে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন।

বিমানের ইঞ্জিনের শব্দ ইতিমধ্যে আরম্ভ হয়ে গেছে।

সর্বশেষ আরও একবার পঞ্চশীলের জয় ধ্বনিও হল সবার কণ্ঠে।

ঠগের পাল্লায় কোকিল

মা-কোকিল "কাকের বাসায় ডিম পাড়ার নতুন কৌশল"—নামক একখানা বই পড়ছিল। হঠাৎ একবার সে ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। সর্বনাশ! আজ পয়লা ফাল্গুন, এখনও ছেলেমেয়েরা শুয়ে আছে? আজ ওরা কলকাতা যাবে, গিয়ে সেখানকার সবাইকে তো জানাতে হবে বসন্তকাল এলো? নইলে ওরা জানবে কি ক'রে? ওখানকার মানুষেরা তো আর কালের ধার ধারে না। কেবল বর্ষায় পথ ডুবে গেলে প্রতি বছর কয়েক দিনের জন্য হৈ-চৈ করে। বলে, এ আমরা কিছুতেই সহ্য করব না। তারপর বর্ষা সরে গেলে সব ভুলে যায়।

তাই সে ওদের কাছে গিয়ে বলল, ওরে তোরা ওঠ। আজ পয়লা ফাল্গুন। তাড়াতাড়ি কিছু খেয়ে নিয়ে শহরে যা।

মা-কোকিল ওদের জাগিয়ে দিয়ে আবার এসে বই নিয়ে বসল।

এমন সময় পাড়ার এক বুড়ী কোকিল এসে বসল ওর কাছে। সম্পর্কে দিদি হয়। সে রোজ একবার আসে নানা উপদেশ দিতে, আর একটু চা খেতে।

তুমি শহরের কথা কি বলছিলে বোন? আমি আবার ঐ কলকাতা শহর দেখিনি। আমাদের কালে কি আর যেখানে-সেখানে যাবার হুকুম ছিল? একটা গাছেই জীবন কাটিয়ে দিলাম।

বোন-কোকিল বলল, দেখ না দিদি, আমার ছ'টি ছেলেমেয়ের কাজ হচ্ছে কলকাতা গিয়ে বসন্তকালের খবর পাঁচজনকে জানান দেওয়া। হাল-আমলে কত সব আইন-কানুন হয়েছে। যার যার এলাকা একেবারে সরকার থেকে বেঁধে দিয়েছে। তুমি ভেবে দেখ দিদি, মস্ত বড় শহর কলকাতা, তাকে ছ'ভাগ করলে এক-একটা ভাগই এক-একটা

বড় শহরের মতন হয়। এর প্রতি ভাগে একটা ক'রে কোকিল ডেকে কি আর বসন্ত নামাতে পারে? কি আর বলব দিদি, প্রতি ভাগে কম

করে দশটা কোকিল দরকার। আচ্ছা না হয় একটা করেই বরাদ্দ হ'ল। তাতেও আপত্তি ছিল না, কিন্তু কলকাতার লোকেরা কি আর এখন কোকিলের ডাক শুনতে চায়, না শুনতে সময় পায়? ছেলে-

মেয়েরা বলে, এখন আর সেখানকার কোনো কবি কোকিল নিয়ে কবিতা লেখে না।

দিদি-কোকিল বলল, বটে! আজকাল ওখানকার অবস্থা এত খারাপ হয়েছে? কেন, ঈশ্বর গুপ্ত, বঙ্কিম চাটুজ্জে, এঁরা বুঝি বেঁচে নেই? আমরা ছোটবেলায় ওঁদের লেখা পড়ে গদ্‌গদ হয়েছি।

তুমি একেবারে সেকেলে, দিদি। ও যুগ কবে চলে গেছে।

তবে তোমাদের কালে কোকিল দিয়ে কি হবে? ছেলেমেয়েদের সেখানে পাঠাচ্ছ কেন?

বা! আমাদের তো একটা কর্তব্য আছে? মানে বসন্ত ঋতুর প্রতি কর্তব্য। সে কথা ভুলে যাচ্ছ কেন? মানুষ যতই খারাপ হোক, আমাদের ডাক তো বন্ধ করতে পারি না।

দিদি-কোকিল বলল, মানুষরা এখন তা হ'লে বুঝি কেবল মানুষের গানই শোনে?

হাঁ দিদি। শুনেছি, রবীন্দো-সঙ্গীত খুব চলছে আজকাল। আমারই এক মেয়ে রবীন্দো-সঙ্গীত শুনে একেবারে গ'লে পড়েছিল। বলে, শুনলে মনটা ভাল হয়, মা। বড় ভাল সে গান। আর সে গানেও কোকিলের কথা আছে।

তবে তাই শিখুক্ না ওরা? যে কালের যা।

ও দিদি, সে চেষ্টাও করেছিল। এই তো গত বছর। ওরা নাম-ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে পঙ্কজ, দেবব্রত, সন্তোষ, সুবিনয়, হেমন্ত, সুনীল, শুভ, আরও কতজনকে গিয়ে ধরেছিল।

ওরা কি বলল?

ওরা এদের ইচ্ছার কথা শুনে খুশীও হ'ল, সবই হ'ল, কিন্তু কপাল! দিদি, কপাল!

সে আবার কি? খুশি হ'ল, তবু শেখাল না?

সেই কথাই তো বলছি। ওরা একে একে বাছাদের সঙ্গে গলার সুর মেলাতে গিয়ে হার মানল। বলল, ওরে বাপ রে! এ যে চিত্তেনও

নয়, একেবারে পরচিতেন! অত চড়া সুরে পারব না। তোমরা বরং মেয়েদের কাছে যাও।

চিতেন, পরিচিতেন, এসব সেকেলে কথা তো বোন, আমাদের কালে কবিগানে শুনেছি। এখনও চড়া সুরকে ঐ নামেই বলে বুঝি—কিন্তু যাক্ গে, তারপর কি হ'ল?

শেষকালে সুনীল রায় বলল, আমি আরও একবার চেষ্টা ক'রে দেখি। যদি পারি, তা হ'লে যে গানগুলোয় তোমাদের কথা আছে, সেইগুলো শিখিয়ে দেব। কিন্তু কত চেষ্টা করল, পারল না। ওর গলা খানিকটা মেলে, কিন্তু সবটা মিলল না।

তারপর?

তারপর গেল ওরা মেয়েদের কাছে। নীলিমা, কণিকা, সুচিত্রা, পূরবী, প্রতিমা, গীতা, সুমিত্রা, সুপ্রীতি, ঋতু, পূর্বা, মঞ্জু এবং আরও অনেকের কাছে, সব নাম মনে নেই। কিন্তু কেউ দম রাখতে পারল না। শেষকালে হতাশ হয়ে পরামর্শ নিতে গেল ওরা সুরেশ চক্রবর্তীর কাছে। সে ওদের দেখেই প্রথমে এসরাজ বার করল। বলল, গলায় যা হ'ল না, এসরাজে তা হবে।

শিখতে পারল?

না, দিদি। ওরা সুরেশের বাজনা শুনল, কিন্তু যে ভাবে বাজাতে হয়, তার কৌশল ওদের দুখানা পায়ে হবে কি ক'রে? দেখে-শুনে বলল, পারব না। আমাদের যা আছে তাই থাক।

সুরেশ বলল, তোমাদের বুদ্ধি আছে।

ভালই বলেছিল।

কিন্তু বুদ্ধি ওদের সে সময়ের জন্য একটুখানি নষ্টই হয়েছিল, দিদি!

ও! এর পরেও চেষ্টা করল বুঝি?

করল আমার বড় ছেলেটা। আর সবাই তখন ঘরে ফিরে এসেছে।

ঠিক এই সময় না, মা, বলে বোন-কোকিলের বড় ছেলেটি এসে

হাজির। বলল, মা, বেশ তো বলে দিলে তোমরা কলকাতা যাও, কিন্তু আমাদের ডায়ারিখানা খুঁজে পাচ্ছি না যে।

সে কি? ঐ তো, ওখানে ওটা কি?

ঐটেই তো খুঁজছিলাম। ওতে কলকাতার কত নম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কা'কে এবারে যেতে হবে, তা লেখা আছে! দুই নম্বর ওয়ার্ডে আমি যেতে ভয় পাই, মা। তাই আগে দেখে নেব, আমার আবার ঐ দুই নম্বরেই এবারেও যেতে হবে কি না।

কেন, সেখানে ভয় কিসের?

সেখানে, জান না তো মা, মুখপোড়ারা থাকে। আমরা যেখানে ছোট গাছের ছোট ছোট ফল খেতে যাই, সেইখানে ওরা আসে কলা পেঁপে কুল খেতে। তাই তো ঐ দুই নম্বর ওয়ার্ডে আমার যেতে ইচ্ছা করে না। বিশ্রী দুশমনদের মতন-এক একটার চেহারা। বাপ রে! মনে করতেও বুক কাঁপে।

সে তো জানি। শুনেছিলাম ঐ সব মুখপোড়াদের ধ'রে ধ'রে বাইরে চালান দেওয়া হবে। ওদের ঝাড়ে-বংশে বিদায় করলে তবে আমাদের শান্তি। কিন্তু সে কথা এখন থাক্ বাছা। রবীন্দো-সঙ্গীত শিখতে গিয়ে তোদের কি সব বিপদ হয়েছিল, বল্ তোর মাসিকে। আমি সুরেশ চক্রবর্তী পর্যন্ত বলেছি।

মাসি, সে বড় লজ্জার কথা। ঐখানেই থেমে গেলে ভাল হ'ত। কিন্তু এক ঠগের পাল্লায় প'ড়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট হ'ল। আর খাটুনি যা হ'ল সে আর কি বলব!

ঠগটা কে?

সে এক কাক। আমি সে দিন ভাইবোনদের বিদেয় দিয়ে সুরেশ চক্রবর্তীর কাছ থেকে উড়ে এসে একটা ডালে বসেছি। মনে বড় দুঃখ। তাই বোধ হয় একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে থাকব। এমন সময় আমার উপরের ডাল থেকে ঐ ঠগটা বলে উঠল, কি হয়েছে ভাই তোমার? কাকের গলায় এত দরদ আমি আর আগে কখনো দেখিনি, মাসি।—

তারপর সে নেমে বসল আমার পাশে। আমার পিঠে ডানা বুলিয়ে দিতে লাগল। বলল, সব কথা খুলে বল।

বললে খুলে ?

বললাম। কাক বলল, মানুষের গান শেখাবার একটা সহজ কৌশল আছে, তোমাকে আমি সব বলছি। কিন্তু তার আগে আমার একটা উপকার করতে হবে।

মাসি, মনে আশা জাগল। রাজি হয়ে গেলাম তার কথায়। সে বলল, এই শহর থেকে, আর শহর থেকে না হোক এই জেলা থেকে, আমার জন্য কিছু সরষের তেল যোগাড় ক'রে আন আগে, তারপর গান শেখার মন্তর ব'লে দেব। তেলটা খাঁটি হওয়া চাই।

কিন্তু মাসি, সমস্ত দিন আমি সমস্ত শহর ঘুরে তেল পেলাম না। ডানা দুটো ব্যথায় টনটন করছিল। মেডিক্যাল কলেজের আউটডোরে গিয়ে কিছু ওষুধের ব্যবস্থা করিয়ে নেব ভেবে সেখানে গিয়ে দেখি, সে কি কাণ্ড! সে যা ভিড় তার মধ্যে পিঁপড়েও ঢুকতে পারে না। তাই কাছাকাছি একটা গাছের ডালে গিয়ে বসলাম। চোখে জল এলো মাসি, ঠেকানো গেল না। এমন সময় দেখি, আমার পাশে আমার চেনা এক বুলবুল পাখী ব'সে আছে। আমরা একই গাছের ফল খেয়েছি কত দিন, তাই চিনতাম। বন্ধু লোক, তাই তাকে সব বললাম। সে বলল, একি অসম্ভব প্রস্তাব! ভেজাল ছাড়া তেল তুমি কোথায় পাবে? তবে হাঁ, মনে পড়েছে। হাজিনগরের হুকুমচাঁদের তিন নম্বর গেট দিয়ে যদি মিতার কাছে যেতে পার, তবে সে বোধ হয় এক সরষের তেলের কারখানার খবর ব'লে দিতে পারবে। ঐদিকে কোথায় যেন মাটির নিচে খ্যাঁকশেয়ালরা এক তেলের কল চালায়। জায়গাটা আমার ঠিক মনে পড়ছে না, মনে পড়লে আমিই বলে দিতে পারতাম।

আমি বুলবুলকে বললাম, ভাই, কাজটি তুমি ক'রে দাও আমার জন্যে। আমি এখন আর উড়তে পারছি না।

সে বলল, বেশ আমি ঠিকানা এনে দিচ্ছি। তবে সেখানেও খাঁটি সরষের তেল পাবে কিনা জানি না।

বুলবুল উড়ে চলে গেল মিতার কাছে। পরদিন সকালে ফিরে এসে জানাল, ঠিকানা পেয়েছি। নৈহাটি স্টেশন থেকে যে পথ হুগলী লাইনের নিচে দিয়ে বেরিয়ে গেছে, তার কিছু দূরে বাঁয়ের দিকে একটা জায়গায় ঘন জঙ্গল। তার মধ্যে ঢুকে যাবে। গেলে দেখতে পাবে একটা শেয়াল সেখানে ব'সে আছে। তোমাকে দেখলেই সে জিজ্ঞাসা করবে, মিত্র না শত্রু? তুমি বলবে, মিত্র। তা হ'লে সে তোমাকে পথ ছেড়ে দেবে। ঐখানে তুমি একটি গর্ত দেখতে পাবে। সোজা সেই গর্তে ঢুকে পড়বে। সেইখানে শেয়ালদের তেলের কল চলছে দিনরাত।

মাসি, আমার তখন ডানার জোর ফিরে এসেছে অনেকটা। আমি সোজা সেই শেয়ালদের কলে গিয়ে পৌঁছলাম।

যা বলেছিল, তাই। এক শেয়াল লাঠি নিয়ে বসে আছে। আমি যেতেই জিজ্ঞাসা করল, মিত্র না শত্রু? আমি হঠাৎ শত্রু ব'লে ফেলেছিলাম আর কি! ভুল হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু "শ" পর্যন্ত বলেই মনে পড়ল। বললাম, মিত্র। আমাকে সে বলল, ঐ গর্তের পথে যাও।

গর্তের পথে গিয়ে দেখি মস্ত কারখানা। অনেক ঘানি চলছে। কিন্তু সামনে অনেকখানি জায়গায় দশ-বারোটা শেয়াল সরষের সঙ্গে কি যেন মেশাচ্ছে। আর একদল শেয়াল সেই ভেজাল মেশানো সরষে নিয়ে ঘানিতে ঢালছে।

একটি শেয়ালকে জিজ্ঞাসা করলাম, ও কি মেশাচ্ছে সরষের সঙ্গে?

সে গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, শেয়াল কাঁটার বীজ মেশাচ্ছি। আমরা শেয়াল তো? বুঝতেই পার, এ ছাড়া আর কি মেশাব? আমরা যদি মানুষ হতাম, তা হ'লে এর চেয়ে মারাত্মক বিষ মেশাতাম।

তা হ'লে এ থেকে যে তেল বেরোচ্ছে, সে তেল তো ভেজাল তেল হচ্ছে ?

তা একটু হচ্ছে বৈ কি।

একটুখানি খাঁটি তেল দিতে পার আমাকে ?

কি ক'রে পারব ? ঘানিগুলো এমন যে শুধু সরষে দিলে চলে না, বন্ধ হয়ে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস কি না।

এর পর মাসি, একটি কথা না বলে সেখান থেকে বেরিয়ে এলাম। প্রথমেই গেলাম সেই কাকের কাছে। কিন্তু কোথায় সে ? সে স্রেফ একটা ধাপ্পা দিয়েছে বুঝতে পারলাম। খাঁটি তেল মিলবে না জেনেই সে আমাকে বোকা বানিয়ে ছাড়ল। আর ও পথে যাইনি তারপর থেকে। ভাল করিনি মাসি ?

খুব ভাল করেছ।

আচ্ছা, তা হ'লে আমরা এখন চলি। আমাদের কর্তব্য আমরা ক'রে যাব। তাতে ফল যাই হোক। একদিন না একদিন মানুষ আমাদের ডাক আবার ভালবাসবে, সেই বিশ্বাস নিয়েই চলেছি, মাসি। আচ্ছা, চলি তা হ'লে ?

তরুণ কোকিলরা সবাই ওদের দু'জনকে প্রণাম করে কলকাতা শহরের দিকে উড়ে চলে গেল।

ওরা পৌঁছে যাবার পর থেকে কলকাতায় বসন্তকাল শুরু হ'ল।

কিন্তু শহরের লোকেরা কেউ তা জানতেও পারল না।

একটি প্রতিবাদ-সভা

অনেক দিনের চেষ্টার পর সভাটি আজ বসেছে। সভায় যারা এসেছে তারা হচ্ছে শেয়াল, কুকুর, বাঘ, সিংহ, গোরু, হরিণ, খরগোশ, কাক, ময়ূর এবং আরও কত রকম পশু আর পাখী!

ওদের মনে অনেক দিনের দুঃখ। আজ সেই দুঃখ ওরা সভায় আলোচনা করবে। এই দুঃখ মানুষের সম্বন্ধে। মানুষ ওদের ওপর নানা ভাবে অত্যাচার করে। অবশ্য সে রকম অত্যাচারের হাত থেকে অনেক সময় ওরা বেঁচেও যেতে পারে। বুদ্ধি খরচ করলে বেঁচে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু মানুষ গল্পের বইতে ওদের সম্বন্ধে যে সব জঘন্য মিথ্যা কথা লিখেছে, তার হাত থেকে বাঁচা যায় কি করে? বই থেকে তো তার কলঙ্ক-কথা মুছে ফেলা যায় না! আর এ বই যে-সে বই নয়, ঈসপের লেখা সব গল্প যা পৃথিবীর সব জায়গায় সব ছেলেমেয়ে পড়ে।

তাই ওরা ঠিক করেছে কিছুদিনের জন্যে ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ না করে এক সঙ্গে মিলে এর একটা প্রতিকার বের করবে।

সভায় সিংহ সভাপতির আসনে বসেছে। সে ঈসপের গল্পের কথা শুনেছে বটে কিন্তু নিজে সে বই কখনো পড়েনি। তাই তার নির্দেশে অন্যান্য পশুপাখীরা একে একে ঈসপের গল্প নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে।

প্রথম বক্তা শেয়াল।

সে বললে, "আঙুর বড় টক" এই গল্পে আমাদের বুদ্ধির উপর আক্রমণ করা হয়েছে। তা ছাড়া এতে একটি মিথ্যা কথাও আছে। মিথ্যা কথাটি হচ্ছে এই যে, আমরা নাকি আঙুর খাই। শেয়াল আঙুর খায় এ কথা অন্তত ভারতবর্ষের শেয়াল সম্পর্কে খাটে না।

গ্রীস দেশে কিংবা ইটালীর শেয়াল সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু জানা নেই, কিন্তু সেখানে দূত পাঠানো হয়েছে, অল্পদিনের মধ্যেই সব জানতে পারব। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা হচ্ছে কোন শেয়াল নাকি আঙুর নাগাল না পেয়ে বলেছে আঙুর বড় টক। কোনো শেয়ালই এ রকম কথা বলতে পারে না। কারণ, শেয়াল বুদ্ধিমান প্রাণী, এ কথা সবাই জানে। আঙুর যদি তার নাগালের বাইরে থাকত, এবং তা খেতে ইচ্ছা হত, তা হলে তা সে বুদ্ধি খরচ করে পেড়েও খেতে পারত।

খরগোশ বলল কচ্ছপের সঙ্গে দৌড়-প্রতিযোগিতায় খরগোশ জাতিকে অপমান করা হয়েছে। কিছুদূর ছুটে গিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়া খরগোশের স্বভাব নয়। এই গল্পে কচ্ছপকে অকারণ মহৎ করা হয়েছে। লোক ভাবছে—কচ্ছপ স্থির, ধীর, অসীম অধ্যবসায়ী এবং লক্ষ্যে পৌঁছানোর আগে কখনো বিশ্রাম করে না, ঘুমোয় না। আমার মতে এই মিথ্যা কথাটি, মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত মানুষেরই ক্ষতি করেছে।

কুকুর বলল, কুকুর সাঁকোর ওপর দিয়ে যেতে নিজের ছায়া দেখে অন্য কুকুর ভেবে মুখের মাংস হারাল ; সেই সাঁকোর উপর সে জীবনে প্রথম যাচ্ছে। এ কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। ঐ সাঁকোর ওপর দিয়ে সে অনেকবার গিয়েছে এবং নিজের ছায়াকে অন্য কুকুর মনে করার ভুলও তার অনেক দিন ভেঙেছে। যদি বলেন, প্রমাণ কি ? তা হলে তার উত্তরে বলি, সাঁকোর ওপর না গেলেও জলের ধারে গিয়ে ঐ কুকুর জীবনে কখনো জল খায়নি এ কথা তো আর মিথ্যা হতে পারে না ? আর জল খেতে গেলেই নিজের ছায়া দেখতে সে বাধ্য। সুতরাং ঈসপের ঐ কুকুর মিথ্যা। এ গল্প সম্পূর্ণ বিদ্বেষ-মূলক।

এর পরে বলতে লাগল কাক।

তার কথা হচ্ছে এই যে, ময়ূর-পুচ্ছ গুঁজে সে ময়ূর সাজতে গিয়েছিল, এ এক অসম্ভব ঘটনা। কারণ আপনারা যে কেউ চেষ্টা করে দেখতে পারেন, ময়ূর-পুচ্ছ কাকের পুচ্ছে গোঁজা যায় না। কিন্তু

তর্কের খাতিরেও যদি ধরা যায় যে তা সম্ভব, তা হলে তার পরিণাম কি হতে পারে কল্পনা করুন। একটি কাক—যার রং কালো—সে নানারঙের পালকে সাজলে কাক-সমাজে তার বেশি আদর পাওয়া উচিত। কারণ, সে একটি নতুন ফ্যাশানের প্রবর্তকরূপে মহা সম্মানের অধিকারী হবে। অন্যদিকে ময়ূরের সমাজেও তার খাতির বাড়বে। আপনারা লক্ষ্য করে থাকবেন, এদেশের লোকেরা যারা সাহেবী পোশাক পরে, তারা এদেশের লোকের কাছেও আদর পায়, সাহেবদের কাছেও আদর পায়। অতএব আমি মনে করি, ঈসপ কাকচরিত্রে অযথা কলঙ্ক লেপনের জন্যেই এই গল্পটি রচনা করেছেন।

এর পরে উঠল ইঁদুর।

সে বলতে লাগল, ঈসপের ইঁদুর-বিদ্বেষ যে খুব বেশি তা তাঁর গল্পেই প্রমাণ। গল্পে আছে, বিড়ালের হাত থেকে বাঁচার উপায় আলোচনার জন্য ইঁদুরের সভা বসেছিল। বহু রকম উপায়ের মধ্যে একটি উপায় সকলেরই পছন্দ হল। একজন বলল, বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বেঁধে দিলে সবচেয়ে ভাল হয়; কারণ বিড়াল একটু নড়লেই ঘণ্টা বেজে উঠবে আর ইঁদুরেরা তাতে সাবধান হতে পারবে। কিন্তু শেষে ঘণ্টা বাঁধবে কে, এই নিয়ে হল গোলমাল ও তাদের সভা পণ্ড হয়ে গেল।

এ গল্পের প্রথম দিকটায় আপত্তির কিছু নেই, কিন্তু 'ঘণ্টা বাঁধবে কে' এই অংশটি একেবারে বাজে। কারণ, সভায় এ রকম একটি কথা উঠতেই পারে না। আজ পর্যন্ত কোন মানুষই কি দেখাতে পারে তাদের সভায় কোন আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত একই সঙ্গে হয়েছে? সভা মাত্রেই শুধু আলোচনা হয়, কি ভাবে কাজ করতে হবে তাও হয় তো আলোচনা হয়; কিন্তু সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করা অসম্ভব।

ইঁদুরের এ কথা শেষ হতে না হতেই আকাশে মেঘ গর্জন করে উঠল। মেঘের ডাকে সবাই আকাশের দিকে তাকাল। দেখতে পেল, একখণ্ড কালো মেঘ তাদের সভাতেই এসেছে কিছু বলতে।

সভাপতি তাকে বলতে অনুমতি দিলেন।

মেঘ বলতে লাগল, একটি গল্পে আছে, সূর্যের সঙ্গে মেঘের তর্ক বাধল কে বড়! একটি লোক যাচ্ছিল জামা গায়ে। সূর্য তাকে দেখে মেঘকে বলল, আচ্ছা ঐ লোকটার জামা কে খুলতে পারে দেখা যাক। মেঘ প্রাণপণে বৃষ্টি বর্ষণ করল, খুলতে পারল না জামা। তখন সূর্য প্রখর কিরণ বর্ষণ করায় লোকটি গরমে অস্থির হয়ে জামা খুলে ফেলল। প্রমাণ হল সূর্যই বড়। এই গল্পটি সম্পূর্ণ নিজের খেয়াল মতো রচনা করা। কারণ যে যুক্তিতে সূর্য বড় প্রমাণ হল, সেই যুক্তিতেই মেঘ বড় প্রমাণ করা যায়। খালি গায়ে একটি লোককে চলতে দেখে যদি বলা যেত ওর গায়ে যে জামা পরাতে পারবে সেই বড়, তা হলে তখনই প্রমাণ হতে পারত যে মেঘ বড়। সুতরাং এই গল্প বিদ্বেষমূলক এবং পক্ষপাতিত্বপূর্ণ।

এইভাবে একের পর একে সবাই এক-একটি বক্তৃতা দিয়ে নিজ নিজ দুঃখের কথা নিবেদন করল। প্রমাণ হয়ে গেল, ঈসপের সমস্ত গল্পেই পশুপাখিদের হীন করা হয়েছে। ঈসপের বিশ্বাস ছিল, মানুষের এতে অনেক উপকার হবে। কিন্তু মানুষ দু' হাজার বছর আগেও যেমন খল ছিল, আজও তেমনি আছে। অবশ্য মানুষদের মধ্যে একদল ভাল লোক বরাবরই আছে, ভাল হওয়ার জন্যে তাদের এসব গল্প পড়ার দরকার নেই এবং এসব গল্প পড়েও তারা ভাল হয়নি। যাদের জন্যে এসব লেখা, তারা আগেও যেমন ছিল, এখনও তেমনি আছে।

সিংহ তার সভাপতির অভিভাষণে এই কথাগুলো বলল; এবং সভায় স্থির হল, সভাভঙ্গে ওরা প্রথম যে-মানুষটির দেখা পাবে, তাকে হত্যা করে মানুষের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানাবে।

সেই উদ্দেশ্যে সিংহ বাঘ এবং অন্যান্যরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এসেই একটি মানুষকে ধরে ফেলল। মানুষ জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের উদ্দেশ্য কি?

ওরা বলল, তোমাকে হত্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

—বিনা কারণে ?

—হ্যাঁ, বিনা কারণে।

মানুষ হঠাৎ আনন্দে গদ্‌গদ হয়ে বলল, আমি তোমাদের কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলাম। কারণ, বিনা কারণে কোন পশু আমাকে হত্যা করুক এই উদ্দেশ্যেই আমি বাড়ি থেকে বেরিয়েছি। অতএব আনন্দের সঙ্গে আমি তোমাদের হাতে আমাকে সমর্পণ করলাম।

সিংহ বাঘ প্রভৃতি ওর এই ধরনের কথা শুনে ভড়কে গেল। কোথায় কাতর স্বরে প্রাণভিক্ষা করবে, তা নয়, নিজের সর্বনাশ করাতেই ওর আনন্দ!

ওরা গোপনে পরামর্শ করতে লাগল। বাঘ বলল, মতলব ভাল নয়। শেয়ালও তাই বলল। শেষে সবাই তাই বলল। সুতরাং ওকে ছেড়ে দেওয়া যাক।

শেয়াল এগিয়ে এসে বলল, যাও, তোমাকে আমরা ছেড়ে দিলাম।

মানুষ "হা অদৃষ্ট" বলতে বলতে দুঃখের ভান করে চলে গেল, এবং বাড়ি পৌঁছে খুব এক চোট হাসল।

একটি সাংস্কৃতিক মিলনের গল্প

॥ এক ॥

গির অরণ্য। জায়গাটা জুনাগড়ের দক্ষিণে অবস্থিত ভারতের একমাত্র সিংহ অরণ্য।

এই অরণ্যের একটি সিংহ গত পয়লা এপ্রিল তারিখে সকালে উঠেই বিদেশী ডাকের একখানা বড় চিঠি পেলেন। চিঠিখানা লিখেছেন মধ্য আফ্রিকার পশু সংস্কৃতি সমিতির অধ্যক্ষ।

সিংহ চিঠিখানা অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন। একবার, দুবার, তিনবার। পড়তে পড়তে তাঁর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল। পড়া শেষ হলে সিংহীকে ডাকলেন।

সিংহী বললেন, কী খবর ?

সিংহ খুব উৎসাহের সঙ্গে চিঠিখানা তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, মস্ত খবর, এই দেখ।

সিংহী চিঠির দিকে চেয়ে একটা একটা অক্ষর ধরে ধরে চিঠি-খানা মনে মনে পড়তে লাগলেন। তাঁর চোখ কুঁচকে যাচ্ছিল। পরে বললেন, দাঁড়াও চশমাজোড়া নিয়ে আসি আগে।

চশমা আনার পর সিংহ বললেন, একটু চেঁচিয়ে পড়, আমি আরও একবার ভেবে দেখি কথাগুলো।

সিংহী পড়তে লাগলেন, "মাননীয় ভারতীয় পশু সংস্কৃতি সঙ্ঘের অধ্যক্ষ মহাশয়, আমরা আফ্রিকার পশুগণ এবারে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে ইচ্ছা করি। আপনারা একবার আমাদের দেশ দেখে গেছেন। সেই সময়ে আপনি সুযোগমতো একবার আমাদের যেতে বলেছিলেন ভারতবর্ষে। আজ এতদিন পরে আমরা আপনাদের দেশ দেখতে বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। অথচ সবই নির্ভর করছে যাতায়াত

ব্যবস্থার উপর। আপনি জানেন আমাদের দেশ পশুপ্রধান হলেও বৈষয়িক দিক থেকে আমরা বড়ই অনুন্নত। আপনাকে একথা জানাবার উদ্দেশ্য এই যে, আমাদের যানবাহনের বড়ই অভাব। এ বিষয়ে আপনাদের সুবিধা অনেক বেশি। আপনি যদি দয়া করে ভারত সরকারের সাহায্যে কয়েকটি বিমান আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন, তা হলে আমাদের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে। শুনেছি ভারত সরকার আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি প্রসারের সমর্থক। এবং আমরা আশা করি সেই সংস্কৃতি শুধু মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই, পশুদের মধ্যেও যাতে প্রসারিত হয়, সে চেষ্টা তাঁরা করেছেন।

যদি বিমানব্যবস্থা করতে পারেন, তাহলে আমাদের দিক থেকে আর কোনো বিশেষ দাবী থাকবে না, শুধু জিরাফদের জন্য বিমানের উপর দিকটা ফুটো করে দিতে হবে, অথবা খোলা বিমান হলে আরও ভাল হয়। জানি না খোলা বিমান আকাশে ওড়ে কি না। না উড়লে উপরের দিকটা এমনভাবে ফুটো করতে হবে যাতে জিরাফরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে। আপনি জানেন ওদের গলা খুব লম্বা।

অন্যান্য কয়েকটি প্রাণী যথা হাতী, জলহস্তী, জিব্রা, উট এদের বিমানের নিচে ঝুলিয়ে নিলেই চলবে। ওদের সঙ্গে আমরা বিমানের ভিতরে একই সঙ্গে যেতে পারব। আমাদের কজনকে আপনারা এ-ভাবে নিতে পারবেন তা আগে জানতে পারলে আমাদের সুবিধা হবে।

সব বিস্তারিত জানাবেন। ইতি আপনাদের আফ্রিকাবাসী অধ্যক্ষ কেশর সিংহ।

সিংহ বললেন, এখন কি করা যায়?

সিংহী একটুখানি ভেবে বললেন, এ তো খুব ভাল প্রস্তাব। ভারত সরকারকে বললে নিশ্চয় কুড়ি-পঁচিশখানা বিমানের ব্যবস্থা করে দেবেন। এমন একটি মহৎ কাজে দেশের সুনাম বাড়বে। তা ছাড়া আমাদের নবজাগরণের যুগে আন্তর্জাতিক সকল পশুর সঙ্গে এখন সংস্কৃতি বিনিময় দরকার। তা ছাড়া আফ্রিকা ও ভারতে যত পশু

আছে এত আর কোনো দেশে নেই। এমন বিচিত্র পশু কোথাও নেই। সিংহ একমাত্র আফ্রিকা ও ভারতে। হাতী-গণ্ডারও তাই। উটও তাই। আবার জিরাফ, চিম্পাঞ্জি, গোরিলা, জিব্রা, একমাত্র আফ্রিকাতে পাওয়া যায়। আমরা দুটি দেশের পশু মিলে সাংস্কৃতিক জোট বাঁধলে অন্য দেশের পশুরাও ক্রমে এসে যোগ দেবে আমাদের সঙ্গে।

সিংহ বললেন, টাইগার কিছু রাশিয়াতে আছে, এবং হাতী ও টাইগার পাকিস্তানে। কিছু সংখ্যক ভারতীয় টাইগার ও চিতা খুব সম্ভব গোপনে ভারত-তিব্বত সীমান্তের ম্যাকমেহান লাইন পারাপার করে, ঠিক জানি না। আর বিশেষ পশু অস্ট্রেলিয়া ও কাছাকাছি দ্বীপে একমাত্র ক্যাঙারু আর ফিলিপিনে ওরান-উটাং। কিন্তু সে যাই হোক, আপাতত ওদের আসবার একটা ব্যবস্থা করা যাক।

সিংহী বললেন, কিন্তু তার আগে তোমাদের নিজেদের মধ্যে একটা বৈঠক বসিয়ে ঠিক কর—তোমরা তোমাদের সংস্কৃতির কোন্ বিভাগ ওদের দেখাতে চাও।

কেন, নাচ আর গান?

ওটা পুরনো হয়ে গেছে। কাজের কিছু কর। মানুষদের মধ্যে ঐ ফাঁকা নাচগান ক্রমে বেড়ে যাচ্ছে জান? ওরা দেশের কোনো খবর রাখে না নাচগান আর অভিনয় ছাড়া। তোমরাও কি শেষে মানুষের এই শূন্য সংস্কৃতির অনুকরণ করবে? সংস্কৃতি কি শুধু নাচগান?

সিংহ ভাবতে লাগলেন। ভেবে বুঝতে পারলেন সিংহী ঠিকই বলেছেন। শুধু নাচগানে আমাদের কোনো লাভ নেই।

॥ দুই ॥

পরদিন ভারতীয় পশুদের কার্যকর সমিতির সভ্যদের কাছে জরুরী চিঠি গেল, ৮ই জুন বৈঠক বসবে স্থান ঠিক হল দার্জিলিং জেলার এক জঙ্গলে কারণ এই দিকেই ভারতীয় প্রায় সকল পশুর বাস। একা

সিংহের পক্ষে এখানে আসায় কোনো অসুবিধা হবে না। আগেও এখানে এরকম বৈঠক বসেছে।

বৈঠকে প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। সিংহ, টাইগার, চিতা, হাতী, গণ্ডার ও একটি হনুমান।

সিংহ প্রস্তাব করলেন, এবারে আফ্রিকার পশুদের সঙ্গে মিলে একটা কোনো কাজের মতন কাজ করতে হবে। স্থায়িভাবে যাতে আমাদের সবার উপকার হয় এমন কিছু। নইলে পশুদের পাড়ায় পাড়ায় যেমন সব সাংস্কৃতিক ফাংশন ক্রমে বেড়েই চলেছে, তাতে অল্প-দিনের মধ্যেই দেখা যাবে পশুজীবনের আর কোনোই উদ্দেশ্য নেই শুধু নাচগান ছাড়া। এ বড়ই ভয়ের কথা।

টাইগার বললেন, আমাদের নিরাপত্তা বাড়ে এমন কিছু করা দরকার। মানুষ যেখানে সেখানে দেখলেই আমাদের উপর গুলি চালায়। আমাদের সংখ্যা বেশি বেড়ে গেলে মানুষদের বিপদ, সেজন্য বছরে কিছু টাইগার মারে তাতে আপত্তি করছি না। কিন্তু মেরে আমাদের জাতিকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে চায়, এইখানে আমার আপত্তি।

হাতী বললেন, একথা আমাদের সবার পক্ষেই খাটে। অতএব কি করা যায় ভাবুন। আমাদের বুদ্ধি কম এ কথা তো আপনারা জানেন। বোকা মানুষকেও মানুষেরা হাতীর মতন বুদ্ধি বলে গাল দেয়। অতএব প্রতিকার চিন্তা আমার দ্বারা হবে না।

টাইগার বললেন, একটা কথা আমার মনে হয় এই যে, আমাদের সব সময় জলের কাছাকাছি থাকতে হয়, কিন্তু জল সব সময় এক জায়গায় থাকে না। গ্রীষ্মকালে পাহাড়ী ছোট ছোট নদী শুকিয়ে যায়, তখন অনেক ঝুঁকি নিয়ে বড় নদীর কাছে যেতে হয়। আর সেখানে গেলেই মানুষ দেখে আমাদের লোভ হয়, আর শিকারী মানুষেরও আমাদের দেখে লোভ হয়। কিন্তু যদি আমরা ভারী পশুদের সঙ্গে মিলে সাংস্কৃতিক নাচ নাচতে নাচতে কোনো নিরাপদ

জায়গায় গর্ত করে ফেলতে পারি এবং একটি হ্রদ তৈরি করতে পারি, তা হলে আমাদের নিরাপত্তা কিছু বাড়তে পারে। ভারী পশুদের নাচে মাটি দেবে যাবে এবং খুব বেশি যদি দাবে, তা হলে একটা স্থায়ী হ্রদ হওয়া অসম্ভব নয়।

হনুমান একথা শুনে বাহবা! বাহবা! করে উঠলেন। বললেন, এর পরে আর কথা নেই। এই প্রস্তাবই পাস হয়ে যাক আমাদের সভায়।

॥ তিন ॥

ভারত সরকার ভারতীয় পশুদের জন্য আগেও অনেক কিছু করেছেন, এবারেও তাঁদের অনুরোধ পালন করতে সহজেই সম্মত হলেন। এবং সম্মেলনটা দার্জিলিং জেলায় বসবে, এ জন্যে বন্য পশু সংরক্ষণে উৎসাহী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনের সফলতার সমস্ত দায়িত্ব নিজ হাতে গ্রহণ করলেন।

দার্জিলিং জেলার তরাই অঞ্চলের অনেক জায়গাতেই এখন হিমালয়ের মূল দেশ উপড়ে ফেলা হয়েছে। ছোট ছোট পাহাড় সমস্তই ব্যবসায়ীরা ওখান থেকে সরিয়ে ফেলে গুঁড়ো করে চালে মিশিয়েছে। চালে কাঁকর মেশানোর এই সুন্দর প্রথাটি না থাকলে পশু সংস্কৃতির এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হত।

যাই হোক সব ব্যবস্থাই খুব মনের মতন হল, এবং আফ্রিকার অধ্যক্ষকে সব জানানো হল। বলা হল, "ত্রিশখানা ভারী মালবাহী বিমানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং জিরাফদের আনার জন্য বিশেষ বিমান পাওয়া গেছে। আপনারা পঁচিশটি আফ্রিকার হাতী সঙ্গে আনবার ব্যবস্থা করবেন। সব হাতীকেই বিমানের নিচে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে তবে আফ্রিকার হাতীর কান খুব বড়, সেইজন্য উড়ন্ত অবস্থায় তাঁদের কান নাড়তে নিষেধ করবেন, কারণ তা হলে বিমানের গতি ঘুরে যেতে পারে।"

এভিন্ন এবারের সম্মেলনের উদ্দেশ্যও তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং অধ্যক্ষ এয়ারমেলে এই উদ্দেশ্যের অভিনবত্বকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে চিঠি দিয়েছিলেন।

ওঁরা ২০শে এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকেলে এসে পৌঁছলেন দার্জিলিং জেলার সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। সব বিমানই বাগডোগরায় নামানো হয়েছিল। সেখান থেকে শোভাযাত্রা করে ওঁরা প্রায় ত্রিশ মাইল হেঁটে গিয়ে পৌঁছলেন যথাস্থানে। ভারতীয় প্রায় সকল পশু, এমনকি বহু পাহাড়ী সাপও অনাহূতভাবে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছিলেন। হাতী, গণ্ডার, টাইগার, জিরাফ, চিতা, জিব্রা, উট, গোরিলা চিম্পাঞ্জি,

হনুমান, প্যাঙ্গোলিন, এমন কি শেয়াল শুয়োরও বাদ যায়নি। মোট একশ হাতী, দশটি জলহস্তী, পঞ্চাশটা গণ্ডার ও অন্যান্য হাল্কা প্রাণী হাজারখানেক।

সভার উদ্দেশ্য ভালভাবে সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর নির্দিষ্ট জায়গা জুড়ে ভারী পশুদের নাচ আরম্ভ হয়ে গেল।

কিন্তু আরম্ভই হল। কারণ কিছুক্ষণের মধ্যেই বোঝা গেল দুই দেশের হাতীর পায়ের মাপ, দুই দেশের গণ্ডারের পায়ের মাপ এবং আফ্রিকার জলহস্তীর পায়ের মাপ আলাদা। কিছুতে ওরা একতালে নাচতে পারে না। আর নাচতে গিয়ে দলের সবাই যদি যার যেমন ইচ্ছা পা ফেলতে থাকে তবে বেশিক্ষণ নাচা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সমান তাল সমান ছন্দ চাই। কিন্তু ওদের সবার পায়ের ছন্দ এক নয়। এ এক দারুণ সমস্যা। গদ্য ছন্দে নাচা যায় না।

তখন ভারতীয় ও আফ্রিকার অধ্যক্ষরা আমার কাছে ছুটে এলো। আমি ছিলাম এই সংস্কৃতি অনুষ্ঠানের সংগঠনকারী একমাত্র মানুষ। শেষে ভেবে দেখলাম এতে অন্যায় নেই কিছু, কারণ মানুষ মাত্রেই বারো আনা পশু এবং অনেকে পনের আনা। আবার এমনও শোনা যায় কোনো কোনো মানুষ ষোল আনা পশু। কিন্তু এ সব কথা তো আর পশুদের কাছে বলা যায় না তা হলে ওরা অপমান বোধ করবে। তাই ওরা আমাকে না জেনেই কিছু সম্মান করে।

সবাই আমাকে ধরল, অবিলম্বে একটা কিছু কর, এতবড় আয়োজন নষ্ট হতে দেওয়া যায় না। আমার জন্য একখানা হেলিকপ্টার জঙ্গলের ঐ নাচের জায়গাতেই প্রস্তুত ছিল, কারণ আমি ওতেই এসেছিলাম। আমি হেলিকপ্টার যোগে বাগডোগরা পৌঁছে সেখান থেকে বিমান নিয়ে কলকাতা পৌঁছেই দু ঘণ্টার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলাম। তিনি সব শুনে আমাকে বললেন, কোনো চিন্তা নেই, সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তুমি চুপ করে ঘণ্টা তিনেক বসে থাক। তারপর তিনি টেলিফোনে নানা জায়গায় কথা

বলে কি ব্যবস্থা করলেন আমি জানি না। তিন ঘণ্টা পরে দেখি কয়েকজন লোক মস্ত বড় একটি ট্র্যানজিস্টার-টেপরেকর্ডার এনে হাজির। মুখ্যমন্ত্রী বললেন এই যন্ত্রের সঙ্গে দুজন লোকও নিয়ে যাও, যা করবার এরা করবে, তোমাদের কিছুই ভাবতে হবে না।

আমি বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনার পরিকল্পনাটা জানতে পারি কি ?

নিশ্চয়। এতে কয়েকটি মিলিত কণ্ঠের গান রেকর্ড করা আছে। এই রেকর্ড বাজাতে আরম্ভ করলে তুমি ওঁদের নাচতে বলবে। দেখবে, আর পায়ের ছন্দে ভুল হবে না। সবাই এক সুরে এক ছন্দে নাচতে ওঁরা এমন মজা অনুভব করবেন যে, শেষে নাচায় একটা নেশা ধরে যাবে, এবং রেকর্ড বাজনা না থামলে ওঁরাও থামবেন না। এতে তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। খুব সৌভাগ্যের কথা যে, আমি সব বিখ্যাত গায়ক-গায়িকাকে অল্প চেষ্টাতেই পেয়ে গিয়েছি, তারা কলকাতাতেই ছিল সবাই। তাই ওদের গান রেকর্ড করানোয় আর কোনো কষ্ট হয়নি। পশুদের মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে সবাই খুব আনন্দের সঙ্গে গান গাইতে রাজি হয়ে গেল। তুমি ওখানে ফিরে গেলেই বুঝতে পারবে সব। দেশের সম্মান বাঁচানোর জন্য তোমার এই চেষ্টাকে আমি অভিনন্দন জানাই।

আমি কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা খুঁজে পেলাম না। সে কথা মুখ্যমন্ত্রীকে জানাতেই তিনি বললেন, তাতে আর কি হয়েছে, আনন্দ বেশি হলে অনেকেই তা প্রকাশের ভাষা খুঁজে পায় না। ভেবে চিন্তে জানালেই হবে।

॥ চার ॥

এবারে যা ঘটল তা সংক্ষেপে বলা অসম্ভব। আমি এসে হাতী গণ্ডার ইত্যাদিকে চক্রাকারে এমনভাবে দাঁড় করিয়ে দিলাম যাতে সমস্তটা

মিলে ঘড়ির স্প্রিং-এর মতন দেখায়। অর্থাৎ একই চক্র ক্রমে জড়িয়ে জড়িয়ে চক্রের কেন্দ্র পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছে।

সবাই এইভাবে অপেক্ষা করছেন, এমন সময় রেকর্ডে বেজে উঠল—

"বৈশাখ হে, মৌনী তাপস,
কোন্ অতলের রাণী
এমন কোথায় খুঁজে পেলে।
তপ্ত ভালের দীপ্তি ঢাকি মন্থর মেঘখানি
এল গভীর ছায়া ফেলে॥"......

সমস্ত হাতী গণ্ডার জলহস্তীর পা এ-গানের সুরে সুরে চঞ্চল হয়ে উঠতে লাগল। তারপর সবার নাচ আরম্ভ হয়ে গেল হঠাৎ। এর টানা ছন্দে সবার পা এক ছন্দে উঠছে, নামছে। সমস্ত জায়গা জুড়ে চক্রাকারে নাচতে লাগল সবাই। পুরো পনেরো মিনিট পরে দেখা গেল মাটি দেবে যাচ্ছে। পশুদের পা হাঁটু পর্যন্ত ঢাকা পড়ে গেছে, হাঁটু দেখা যায় না। নাচের সাফল্যে দর্শকেরা এক বিপুল উত্তেজনায় হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

এরপর একটুখানি বিরতি। কিন্তু নর্তক-নর্তকীরা বিরতি চান না। তাঁদের মনে বিপুল পুলক। তাঁরা অস্থির।

তারপর দ্বিতীয় গান আরম্ভ হল—

"এসো এসো হে তৃষ্ণার জল কলকল ছলছল,
ভেদ করো কঠিনের ক্রূর বক্ষতল কলকল ছলছল্।
এসো এসো উৎসস্রোতে গূঢ় অন্ধকার হতে
এসো হে নির্মল, কলকল্ ছলছল্।"......

এ গানের উত্তেজনা আগের গানের চেয়ে যেন দশগুণ বেড়ে গেল। এর ছন্দে নতুন প্রাণের আবেগ। নতুন চঞ্চলতা। তাই এ গানে মাটি দেবে গেল আরও বেশি। এত বেশি যে এখন একমাত্র আফ্রিকার

হাতীদের মাথা দেখা যাচ্ছিল। যেন পঁচিশটি মাথার চক্র ঘুরছে সেই গভীর খাদের বেড় ঘিরে। পঁচাত্তরটি ভারতীয় হাতী ও অন্যান্য পশুর কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, তাঁরা যেন মাটির নিচে তলিয়ে গেছেন।

তখনও গান চলছে—

"মরুদৈত্য কোন মায়াবলে
তোমারে করেছে বন্দী পাষাণ শৃঙ্খলে
ভেঙে ফেলে দিয়ে কারা
এসো বন্ধনহীন ধারা,
এসো হে প্রবল, কলকল্ ছলছল্।"

এরপর কোনো পশুরই কোনো চিহ্ন নেই, কিন্তু নাচের শব্দ যেন আরও গম্ভীর ধ্বনিতে পাতালদেশ থেকে সমস্ত আকাশে উঠে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। বিরাট এলাকা জুড়ে হ্রদ হচ্ছে!

এমন সময় হঠাৎ জলের কলধ্বনি! জল কি তবে সত্যিই বেরিয়ে এলো পাষাণ শৃঙ্খল ভেঙে? হাজার পশুর আনন্দ কোলাহলে সেখানে তখন এক অদ্ভুত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

হ্রদের একটা পাশ নাচবার সময়েই বুদ্ধি করে ওঁরা ঢালু রেখেছিলেন, সেই পথে সবাই উপরে এলেন হল্লা করতে করতে। সবার গা ঘেমে উঠেছে, কিন্তু এত পরিশ্রম সফল হয়েছে দেখে তাঁরা সকল ক্লান্তি ভুলে গেছেন।

বন্ধুগণ, এ এক আশ্চর্য পরিকল্পনা……

গান তখনও চলছে কলকল্ ছলছল্। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিখ্যাত সব গায়ক-গায়িকা। সবার মিলিত কণ্ঠের গান আর তা এমন সুন্দরভাবে গাওয়া যে, এ গানের রেকর্ড মরুভূমির মধ্যে গিয়ে বাজালে সেখানেও জল উঠে পড়ত।

শুকনো পাহাড়ের পায়ে হঠাৎ এতবড় হ্রদ আর তার ঝলমল করা জল দেখে আকাশপথে হাজার হাজার পাখি ছুটে এলেন গান করতে

করতে। ময়ূররা নাচতে লাগলেন। অতিথি পশুরা এবং উপস্থিত ভারতীয় পশুরা হ্রদের ধারে গিয়ে মাথায় সেই পবিত্র জল ছিটিয়ে দিতে লাগলেন। সে কি কলরব আর উত্তেজনা!

আফ্রিকার দলপতি কেশর সিংহ সবাইকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, বন্ধুগণ, এ এক আশ্চর্য পরিকল্পনা আপনাদের। আপনাদের ভারতীয় আদর্শ শুধুই স্বপ্ন দেখা নয়, তা যে গঠনমূলকও আজ তার প্রমাণ পেয়ে আমরা ধন্য হয়েছি। আপনাদের কাছে আজ আমরা একটা বড় শিক্ষা লাভ করলাম। সংস্কৃতিকে যে দরকার মতন সমাজের উন্নতির জন্য ব্যবহার করা যায়, এ কথা আমাদের জানা ছিল না। আমাদের আফ্রিকার তরুণ পশুরা সংস্কৃতি মানে শুধুই নাচগান বোঝে। অনেক সময় এর জন্য জোর জবরদস্তি করে চাঁদা আদায় করে। সমাজের যাতে কোনো উপকার হয় না, তার জন্য নিরীহ পশুদের কথায় কথায় চাঁদা দিতে হয়। কিন্তু আপনাদের কাছে এসে আমাদের এক নতুন শিক্ষা হল। এই শিক্ষাই দেশে ফিরে গিয়ে প্রচার করব এখন থেকে।

আর এতে আপনাদেরও একটা স্থায়ী উপকার হল। এখন আর আপনাদের নানা জায়গায় ছড়িয়ে থাকতে হবে না। ছড়িয়ে থাকাই দুর্বলতা। একসঙ্গে থাকলে শিকারী মানুষই আপনাদের দেখে ভয় পাবে।”

॥ পাঁচ ॥

এরপর অনেকেই বক্তৃতা করলেন। কিন্তু বক্তৃতা শোনবার মতন মনের অবস্থা তখন কারোই নয়। সবার মনে উত্তেজনা।

আফ্রিকা থেকে দুটি জিরাফ এসেছিলেন! তাঁদের একটিকে খুব কাছে থেকে দেখে আসামের এক গণ্ডার স্তম্ভিত। গণ্ডারদের দৃষ্টি স্বভাবতই কিছু ক্ষীণ, সেজন্য জিরাফের অদ্ভুত লম্বা গলা ঐ গণ্ডারটি দূর থেকে দেখতে পাননি আগে। এখন দেখে অবাক হয়ে গেছেন।

তাই কিছুক্ষণ তাঁর দিকে চেয়ে থেকে গণ্ডার তাঁকে বললেন, মাপ করবেন জিরাফ মশাই, আমাদের সবারই শর্ট সাইট, বেশি দূরের জিনিস ঝাপসা দেখি। তাই এতক্ষণ আপনাকে দেখতে পাইনি, কিন্তু এখন কাছে থেকে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছি।

কিন্তু জিরাফ এ কথার কোনো উত্তরই দিলেন না। গণ্ডার তাঁর এই ব্যবহারে কিছু ক্ষুণ্ণ হচ্ছিলেন, এমন সময় একটি গোরিলা দূর থেকে এটি লক্ষ্য করে তাড়াতাড়ি ছুটে এলেন, এবং গণ্ডারকে বললেন, এঁর নাম জিরাফ একথা অবশ্য আপনার জানা আছে, কিন্তু একটা কথা বোধহয় জানা নেই যে, এঁরা কেউ কথা বলতে পারেন না। জিরাফ মূক প্রাণী। তবে এঁর সঙ্গে আর একটি জিরাফ এসেছেন, তিনি সামান্য দু-এক কথা বাংলা বলতে পারেন। কয়েক বছর আগে আপনাদের সুনীতি চাটুজ্জে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন, তখন তিনি শব্দের উচ্চারণস্থান দেখিয়ে এবং বুঝিয়ে ওঁকে দিয়ে কিছু কিছু কথা বলাতে পেরেছিলেন। কিন্তু হলে কি হবে? ওঁদের ফুসফুস মুখের উচ্চারণ স্থান থেকে আধ মাইল দূরে। ওখান থেকে হাওয়া কণ্ঠে উঠে আসতে না আসতে মিলিয়ে যায়।

গণ্ডার বললেন, তাই না কি? তা বেশ। যার যেমন আছে তাই ভাল। অন্যান্য নানা বিষয়ের আলাপ হল ওঁদের খাবার সময়। হাতীদের জন্য পাঁচ শ কলাগাছ আনা হয়েছিল। আফ্রিকার চিতারাও বললেন, আমরাও নিরামিষ খাব। কাজেই দুধ যোগাড় করতে হল অনেক। পাহাড়ী গাইরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ওঁদের জন্য দুধ দান করলেন। ভালুকেরা বললেন তাঁরা বন থেকে মধু সংগ্রহ করে খাবেন। জিরাফ, জিব্রা, ওকাপি—এঁদের জন্য আর ভাবতে হল না, কারণ চারদিকে গলা বাড়ালেই খাদ্য।

এরপর ওঁদের ফিরে যাবার পালা। কিন্তু কেশর সিংহ প্রস্তাব করলেন, যদি অসুবিধা না হয় তা হলে আপনাদের পশুশালাটি একবার দেখে যেতে চাই।

ভারতীয় সিংহ বললেন, এ তো খুব উত্তম কথা। আমরা নিশ্চয় একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

ব্যবস্থা করার ভার অবশ্য আমার উপর পড়ল।

কলকাতা যাবার ব্যবস্থাটা হল রাত্রে। ঠিক হল কলকাতার রেস খেলার মাঠে একে একে বিমান গিয়ে এক এক দল পশুকে নামিয়ে দিয়েই ফিরে চলে আসবে, এবং সেখান থেকে সকালবেলা সবাই শোভাযাত্রা করে চিড়িয়াখানায় গিয়ে উপস্থিত হবেন।

॥ ছয় ॥

চিড়িয়াখানায় সে এক বিষম কাণ্ড। আফ্রিকার হাতী, গোরিলা, চিম্পাঞ্জি, ওকাপি, গণ্ডার, জলহস্তী, চিতা, জিরাফ, জিব্রা প্রভৃতি কলকাতার চিড়িয়াখানা দেখতে এসেছেন, এ খবর সকালবেলাই সব জায়গায় প্রচার হয়ে গেল। কত লোক যে সেদিন এখানে এলো তার হিসাব নেই। পশুশালার সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বললেন, আমি যতদিন এখানে আছি, ততদিনের মধ্যে কখনো একদিনে এত লোককে এখানে দেখিনি। আর এত অটোগ্রাফ নেওয়ার ঘটা।

কিন্তু আফ্রিকার অতিথিরা কয়েকটি জিনিস দেখে খুব খুশি হতে পারলেন না। এক জায়গায় দেখলেন কয়েকটি হাতী, কিন্তু তাঁদের পায়ে শিকল বাঁধা। এই দৃশ্যে আফ্রিকা হাতীরা স্বভাবতই দুঃখ পেলেন। বন্দী হাতীরা কিন্তু বললেন, এতে তাঁদের খুব অসুবিধা হয় না। পায়ে শিকল না থাকলেই বরং অন্য পশু এবং মানুষদের একটু অসুবিধা হত। তা ভিন্ন মুক্ত হস্তীও তো আছেন। দর্শকরা আমাদের সবাইকে মুক্ত হস্তে অনেক খাদ্য দান করেন। বসে বসে খাওয়ায় একটা নতুন ধরনের সুখ আছে। বন্দী সকল পশুরই ঐ এক কথা। বন্দী বাঘ এবং অর্ধ মুক্ত বাঘ দুরকমই আছেন এখানে। আরও বহু

পশু আছেন বন্দী অবস্থায়। তাঁদের প্রত্যেকেরই মত এই যে, মুক্ত জীবনে অনেক ঝুঁকি আছে, অনেক বিপদ আছে, কিন্তু অনেক সুখও
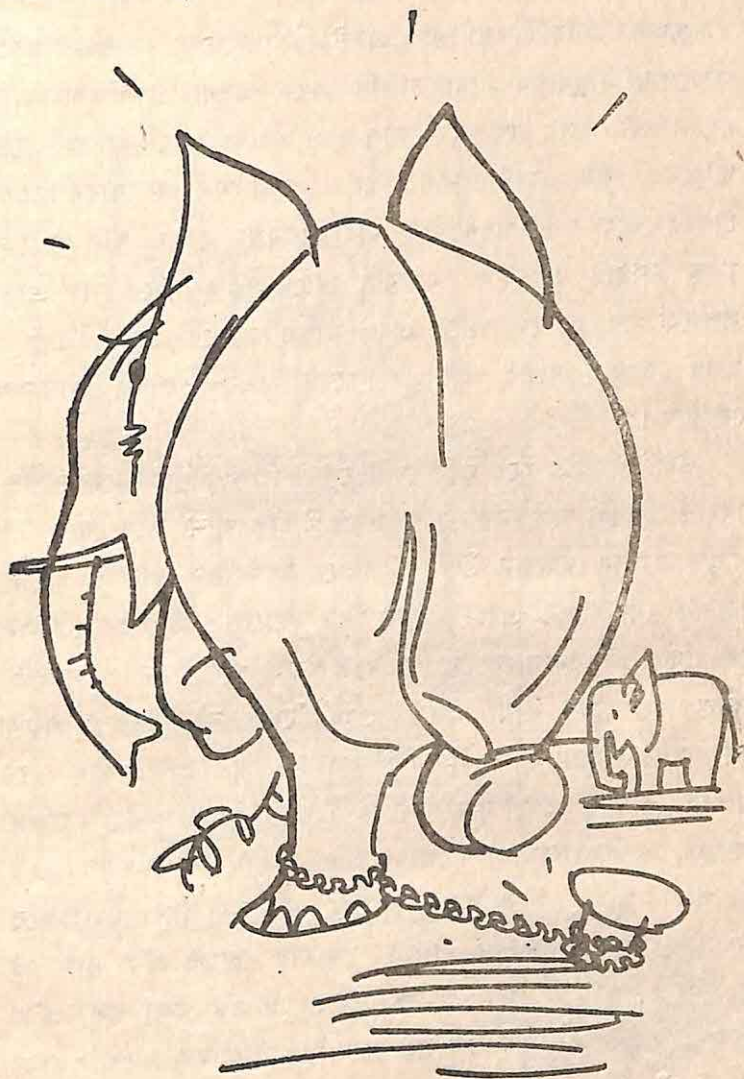
আছে। আবার বন্দী জীবনে অনেক দুঃখ আছে, তবু অনেক সুখও আছে। মুক্ত জীবনে আহার জোটানো দায়। দুচার দিন অনেক

সময় না খেয়েও থাকতে হয়, আর এখানে? এখানে একটা বাঁধাধরা র‍্যাশন আছে, সকালে উঠেই পাওয়া যায়।

কেশর সিংহ একথা শুনে একটু চিন্তা করলেন, তারপর বুঝতে পারলেন, মানুষদের মধ্যে চাকরি শেষে অবসর গ্রহণ করলে তারা যেমন তখন অলস হয়ে পড়ে, তাস দাবা খেলে সময় কাটায় এদের জীবনেও সেই ভাবটা এসে গেছে। এরা যেন এই যৌবন বয়সেই চাকরি থেকে অবসরগ্রহণ করে বাঁধা পেনশন পেয়ে খুশি আছে। কিন্তু উপায়ই বা কি? মানুষরা এখানে এদের দেখতে পায়, এদের সম্পর্কে সব জানতে পারে এবং আরও জানতে চায়। এবং এ রকম জেনেছে বলেই এখন মানুষদের মধ্যে পশুজীবন রক্ষার কথা জেগেছে।

ওঁরা ভিতরটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলেন, কিন্তু মানুষের ভিড়ে অসুবিধাও হচ্ছিল কম নয়। জিরাফের খাঁচার পাশ দিয়ে যেতে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখলেন ওঁরা। সেখানে কয়েকজন বাঙালী মহিলা জিরাফ দেখছিলেন এবং পাশের এক ভদ্রলোক তাঁদের বলছিলেন, জিরাফেরা গলা দিয়ে কোনো শব্দ বার করতে পারেন না। পৃথিবীর সমস্ত পশুপাখির ভাষা আছে, শুধু এঁদের নেই। কিন্তু একথা শোনামাত্র একজন মহিলা গলায় আঁচল জড়িয়ে দুহাত জোড় করে মাথায় ঠেকিয়ে চোখ বুজে শিবের উদ্দেশে বলতে আরম্ভ করলেন, "ঠাকুর, এতদিন তোমারই পুজো করেছি আমরা, শিবঠাকুরের মতন বর পাবার জন্য। কিন্তু ঠাকুর, তুমি আমাকে ক্ষমা করো। পরজন্মে যেন জিরাফের মতন বর পাই। তোমার চেয়েও এঁরা ভাল এই কারণে যে, তুমি উদাসীন হলেও তো দু চারটে কথা বল, এঁরা কোনো কথাই বলেন না। এই রকম পুরুষই আমরা এতকাল চেয়ে আসছি।"

কেশর সিংহ ও তাঁর সঙ্গীরা ওখান থেকে সরে গেলেন এবং কথাটা অন্যান্য সঙ্গীদের কানে কানে বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই কথাটা

সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল এবং তাঁরা মনে মনে খুবই মজা অনুভব করতে লাগলেন।

আলিপুরের পশুশালায় এসে আফ্রিকার অতিথিরা নানারকম অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে চললেন দেশে। যাবার ব্যবস্থাও ঠিক আসার

ব্যবস্থার মতন নির্ঝঞ্ঝাট হল। কত যে বিদায়ী বক্তৃতা দুদেশের পশুরা করলেন তার সংখ্যা নেই। কত কৃতজ্ঞতা, কত ধন্যবাদ, কত প্রশংসা।

ঠিক হল ওঁরা দেশে ফিরে গিয়ে ভারতীয় পদ্ধতিতে সংস্কৃতি-নাচ নাচবেন, এবং যদিও আফ্রিকায় ওঁদের বাসস্থানের কাছে অনেক হ্রদ ও নদী আছে, তবু পশুদের জন্য একটা পৃথক হ্রদ তাঁরা নিজেরাই তৈরি করে নেবেন। এজন্য তাঁদের ঐ টেপ রেকর্ড ও রেকর্ডার যন্ত্রটি যাতে বিনা শুল্কে নেওয়া যায় সে ব্যবস্থাও করা হল। আফ্রিকায় এখন আমাদের ভারতীয় "ইমেজ" সুন্দরভাবে দেখানো দরকার সেজন্য রাজ্য সরকার খুব আনন্দের সঙ্গে ব্যবস্থাটি করলেন।

সবাই যেমন এসেছিলেন তেমনি বিদায় হয়ে চলে গেলেন।

আফ্রিকায় পৌঁছে কেশর সিংহ চিঠি দিয়ে জানালেন, তাঁরা সবাই নিরাপদে পৌঁছেছেন। শুধু একটা অভাব তিনি বোধ করছেন। ভারতে থাকতে "ব্ল্যাকমার্কেট" কথাটি তাঁর কানে এসেছে অনেকবার। ওটা নিশ্চয় কোনো আশ্চর্য জিনিস হবে। কিন্তু ওটা সত্যিই কি, তা জানবার জন্য তাঁর মন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। আফ্রিকাতেও ঐ জিনিসটা আনা যায় কিনা তা তাঁর জানা দরকার।

চিঠিটা তিনি আমার নামেই লিখেছিলেন।

কুড়ানো কণা

ওর নাম রাখা হল কণা। ছোট্ট একটি কণিকা মাত্র। এক মাসও বয়স হয়েছে কিনা সন্দেহ। দোতলায় উঠতে সিঁড়ির ধারে কুড়িয়ে পেয়েছিল সরলা। এমন সুন্দর বেরালছানা যে কুড়িয়ে পাওয়া যায় তা কি কেউ আগে ভাবতে পেরেছে? গায়ের রং কি চমৎকার। সাদার উপর বড় বড় দুতিনটে হাল্কা বাদামী রঙের ছাপ। মাথার দুপাশে দুটো কানসুদ্ধ মাথাটি বাদামী-আর-কালো রঙে ভাগ করা। মানে, ওর একটি কান কালো, আর একটি কান বাদামী।

কিন্তু শুধু কানের কথা বলেই কি কণার কথা শেষ করা যায়? ওর আসল পরিচয় হচ্ছে ল্যাজে। অন্য সব বেরালের মতো নয়। তাদের ল্যাজের কথা মানেই লাজের কথা, কিন্তু কণার ল্যাজ প্রদর্শনীতে প্রথম পুরস্কার পাবার মতো। কি গৌরব তার! (হায়রে, যদি "গৌরবের" বদলে "বেরাল-রব" বলে কোনো কথা থাকত!) কিসের সঙ্গে তুলনা করব তার? তুলোর সঙ্গে? তার চেয়ে ল্যাজের সঙ্গেই তুলোর তুলনা করা ভাল। মানে, তুলো কেমন? না, কণার ল্যাজের মতো। এই ল্যাজের নামে কণা যতখানি তুলো বয়ে বেড়াচ্ছে তার যদি ওজন থাকত, তা হলে ল্যাজটার ওজন কণার ওজনের সমান হত নিশ্চয়।

এই সব দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল যে কণা পথের বেরাল নয়। কারণ আসামাত্র ওর যে পরিচয় পেলাম তাতে অবাক হতে হল। চরিত্র অতি ভদ্র, ব্যবহার অতি সুন্দর, চাল-চলন উচ্চ বংশের। খাবার দিকে লোভ নেই। আসামাত্র খেলতে শুরু করল। আর সে কি খেলা! ওদিকে রেডিওতে আবার ঠিক এই সময়েই পঙ্কজ মল্লিক গান ধরে দিয়েছেন "কী খেলা তব…।"

দুদিনের মধ্যে আমাদের সঙ্গে ওর ভাব জমে উঠল, যেন কতকালের

আপনার জন। কিন্তু হায় রে, যা সন্দেহ করেছিলাম তাই ফলে গেল দুদিনের মধ্যে। ওটা নাকি আমাদেরই নিচের বাসিন্দাদের সংগ্রহ
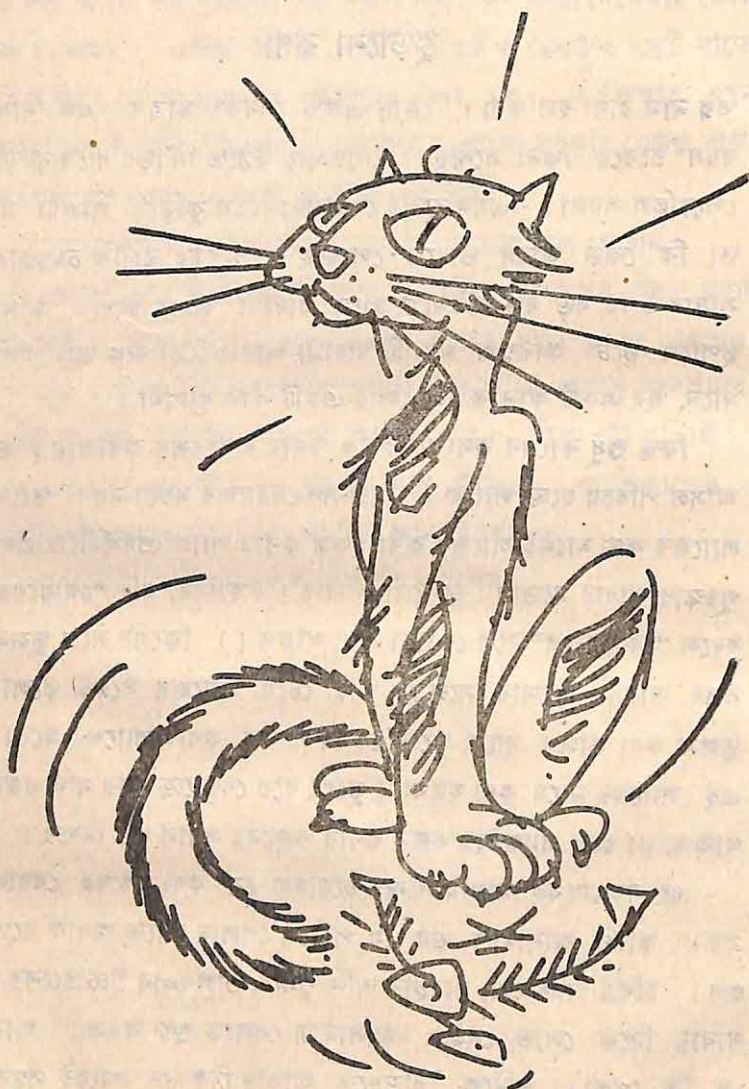
করা বেরালছানা। তাদের বাড়ির ছোট্ট মেয়ে মায়া ওকে হারিয়ে নাকি এ দুদিন কেবলই কেঁদে বেড়াচ্ছে।

খবর রটে গিয়েছিল যে আমাদের বাড়িতে একটি চমৎকার বেরাল-ছানা এসেছে। ওরা এত দেরিতে শুনল কি করে জানি না, কিন্তু হঠাৎ সেদিন ডাকাতের মতো এসে পড়ল আমাদের বাড়িতে, এবং এসেই বলল, "ওটি আমার বেরালছানা।"

আমাদের আর কথা বলবার উপায় ছিল না, ওর দাবী ন্যায়সঙ্গত, ওরই পাওনা ওটা। কিন্তু কণার উপর ইতিমধ্যে আমাদেরও কিছু দাবী জন্মে গেছে। কি দুঃখ যে হল। শেষে রবি ঠাকুরের একটি গান গেয়ে সান্ত্বনা লাভের চেষ্টা করলাম—"কণাটুকু যদি হারায় তা হলে প্রাণ করে হায় হায়!"

মায়ার দাবী ন্যায়সঙ্গত, আমাদের দাবী ন্যায়সঙ্গত নয়, সবাই বল-ছিল এই কথা। এমন সময় কণা নিজেই তার বিচার করতে শুরু করল। ওকে নিয়ে যাবার ঘন্টাখানেক পরেই দেখি এক কাণ্ড! দরজার বাইরে মিউ শব্দ। অতটুকু কণা সিঁড়ি বেয়ে ঠিক উপর উঠে এসেছে!

এর পর থেকে মায়া ওকে যতবার নিয়ে যায়, ততবারই পালিয়ে চলে আসতে লাগল। আশ্চর্য টান! কিন্তু কেন, তা-কেউ বলতে পারল না। মায়ার দুঃখ দেখে বড় দুঃখ হতে লাগল। ও জানে কণা একমাত্র তারই বেরাল, তাই সে ওর চলে আসাটা সইতে পারছিল না। কেঁদে এসে পড়ত আমার বেরাল দাও বলে। যেটুকু সময় ওকে হাতে পেত, তাতেই ও সান্ত্বনা পেতে লাগল অগত্যা।

এমনি ভাবে চলল মাসখানেক। তারপর মায়া একদিন তার মামাবাড়ি না কোথায় চলে গেল, এবং এই সুযোগে কণাও সম্পূর্ণ আমাদের হয়ে গেল।

মাস তিনেকের মধ্যে কণাকে আর চেনা যায় না। তার ল্যাজ আরও মোটা হয়েছে, আদর পেয়ে পেয়ে চেহারাও হয়েছে ঠিক রাজ-কন্যার মতো। খেলায় আরও উন্নতি করেছে, ওস্তাদিতে নীলিমা গাঙ্গুলীকে হার মানায়। এখন সে হেলে দুলে হাঁটে শুধু খেলার সময় তার পায়ে পায়ে বিদ্যুৎ খেলে। সন্ধ্যায় একবার করে বইয়ের তাকের

পিছনে, আলমারির মাথায়, খাটের নিচে এবং যেখানে যত রহস্যময় জায়গা আছে সর্বত্র সে খুব মনোযোগের সঙ্গে শুঁকে শুঁকে বেড়ায়।

এখন একটু একটু বাইরে যেতেও শিখেছে, কিন্তু গিয়ে বেশিক্ষণ থাকে না, অন্য বেরাল তাড়া করে এলেই ছুটে পালিয়ে আসে।

কিছুদিনের মধ্যেই হঠাৎ একদিন গলির মধ্যে এক অদ্ভুত আওয়াজ শুনে কণা সচকিত হয়ে উঠল। সেই অদ্ভুত বিকট আওয়াজে অস্থির হয়ে উঠলাম আমরা। ছোট ছেলেরা ঠাট্টা করে বলল হিন্দি শেখার নৈশবিদ্যালয় খুলেছে বেরালেরা। রাত্রি দশটায় একটা গুণ্ডার মতো বেরাল ভাঙা গলায় "আও, আও, আও" করে বেড়াচ্ছে গলির মধ্যে। বোধ হয় গুরু ছাত্র খুঁজছে। হিন্দি ছাড়া তার মুখে আর কথা নেই।

ক্লাসে যোগ দেবে কিনা কণা ভাবতে লাগল; কিন্তু স্বজাতিকে ও ভাল করেই চেনে, তাই দূর থেকেই কান হেলিয়ে হেলিয়ে সেই গুরু-চীৎকার শুনল, কিন্তু গেল না।

এর মধ্যে এক দিন দুপুর রাতে অনেকগুলো বেরালের তুমুল ঝগড়ার আওয়াজ শোনা গেল, জেগে দেখি কণা ঘরে নেই। কণাও যে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে পারে তা ভাবতে পারিনি। এর পর থেকে কণা একেবারে নিখোঁজ।

পাওয়া গেল তাকে তিনদিন পরে। বোঝাই গেল, খাওয়া জোটেনি। চেহারা বিশ্রী হয়ে গেছে। ল্যাজটি দেখাচ্ছে যেন পৌষ মাসের শুকনো কাশফুল। আসল চেহারা ফিরে পেতে ওর প্রায় সাতদিন লাগল। দিন যায়, এদিকে মায়া ফিরে এসেছে মামাবাড়ি থেকে, কিন্তু এতদিনেও সে কণার কথা ভোলেনি। অবুঝ মেয়ে, আমাদের বাড়িতে এসেই বলতে লাগল "আমার বেরালছানা দাও।"

এখন আর কণাকে দেওয়ায় কারো আপত্তি ছিল না কারণ সে এখন পোষ মেনে গেছে। সরলা তাই কণাকে মায়ার হাতে তুলে দিতে গেল। মায়া কিন্তু কণাকে দেখেই কেঁদে ফেলল, এবং বলল "আমার বেরালছানা চাই, আমার বেরালছানা। ও বড় বেরাল আমি নেব না।"

চার মাস আগের কণামাত্র বেরালছানা আজ বড়সড় হয়ে উঠেছে, মায়ার কাছে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সে মনে করেছে সরলা তাকে ঠকাচ্ছে। ছোট বেরাল এত অল্পদিনে এত বড় হয় সে অভিজ্ঞতা মায়ার ছিল না। সে নিজে ছেলেমানুষ আছে, অতএব তার বেরাল-ছানাও ছেলেমানুষ থাকবে—সোজা কথা।

তাকে কিছুতে বোঝানো গেল না। সে কেঁদে আকুল হল তার বেরালছানা চাই বলে। বোধ হয় সরলার প্রতারণা তাকে আরও দুঃখ দিয়েছিল। অবশেষে আমি তাকে একদিন বললাম, "তোমার বেরাল-ছানা শীগগিরই এনে দেব।" কিন্তু কোথায় বেরালছানা? কত দিন ধরে খুঁজলাম পাওয়া গেল না একটা। যা তা হলে তো চলবে না, কণার মতো হওয়া চাই। মহা ভাবনায় পড়া গেল।

আরও দুটি মাস কেটে গেল, লজ্জায় মায়াকে আর মুখ দেখাতে পারি না। এমনি সঙ্কটকালে কণা নিজেই আমাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করল। আগেই তো বলেছি ওর মতো বেরাল হয় না। কণার প্রতি কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠল।

দিন কুড়ি বাইশ পরে মায়াকে ডেকে এনে বললাম, "পেয়েছি বেরাল-ছানা। তিনটে পেয়েছি, এর মধ্যে তোমারটাও আছে, বেছে নাও।"

মায়া যে কি খুশি হল! আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কি বিপদেই না পড়েছিলাম।

কণাকে প্রশংসা কে না করবে? ঠিক তার ছেলে বয়সের চেহারা-ওয়ালা একটি বাচ্চা ছিল তিনটির মধ্যে। কিন্তু একটু তফাত ছিল। কণার একটি কান কালো, একটি বাদামী—কিন্তু এই বাচ্চাটির দুটি কানই বাদামী। ক'দিন হল চোখ ফুটেছে ওদের। মায়া কিন্তু বুঝতে পারল না কি করে কণাকে সে ফিরে পেল। ধরতেও পারল না যে তার একটি কান কালো ছিল। ছেলেমানুষ কিনা, তাই কালো কানের কলঙ্ক ওর কাছে অনাবিষ্কৃত রয়ে গেল, শুধু, আমার এই গল্পে সেই কলঙ্কের কথাটি আর চেপে রাখা গেল না।

পশুশালায় মুক্তি আন্দোলন

গভীর রাত্রি। চারদিক নিস্তব্ধ। তারই মধ্যে হঠাৎ একটুখানি শব্দ হল। সঙ্গে সঙ্গে রাত্রির অন্ধকার শিউরে উঠল। মনে হল যেন কোনো বন্দী তার পায়ের শিকল কাটছে।

মাঝে মাঝে গভীর রাত্রে এইখানে ঐ রকম শব্দ শোনা যায়।—এইখানে, এই পশুশালায়। এ হচ্ছে তোমাদের অত্যন্ত পরিচিত আলিপুরের পশুশালা।

কিন্তু পশুশালায় কোন্ সে বন্দী যার পায়ে শিকল আছে? দেখনি? হাতী পাড়ায় যাওনি কখনো? দেখেছ সেখানকার হাতীদের। তাদের সবারই পায়ে শিকল বাঁধা। দিনের বেলা যাকে পিঠে ক'রে মানুষ ব'য়ে নিয়ে যেতে দেখেছ সেও রাত্রিতে বন্দী হয় আর সবারই মতো।

তোমরা দেখেছ হাতীরা অত্যন্ত নিরীহ। অতবড় বিরাট দেহ, অথচ তা যেন মাটি দিয়ে তৈরি। কিন্তু মনটা যদি তাদের দেখতে!

সেই মনের মধ্যে তাদের আগুন জ্বলছে। দিনের পর দিন তারা বন্দীজীবন কাটিয়ে চলেছে আলিপুরের পশুশালায়। কিন্তু আর তারা তা সহ্য করতে পারছে না। তারা ঐ বন্দী অবস্থা থেকে মুক্তি চায়। তাই প্রতিদিন গভীর রাত্রে শিকল ভাঙতে চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যর্থ হয় তাদের চেষ্টা, মনের জ্বালা মনেই থেকে যায়, মুক্তি তারা পায় না।

তারা প্রতিদিন যুক্তি করে কি ক'রে মুক্তি পাওয়া যায়। একার চেষ্টায় তা সম্ভব? ওরা অনেক দিনের ব্যর্থ চেষ্টার পর বুঝতে পেরেছে একার চেষ্টায় সম্ভব নয়। তারা বুঝতে পেরেছে এক দিনে যদি পশুশালার সবাই মিলে বিদ্রোহ করা যায় মানুষের বিরুদ্ধে তা'হলে হয় তো সম্ভব হবে।

কিন্তু সবাই যদি রাজি না হয় ?

রাজি না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে ? হাতীরা জানে পশুশালায় যত পশুপাখী আছে তারা সবাই অসুখী। তারা সবাই একই ভাবে বন্দী। হাতীপাড়ার কাছাকাছি উষ্ট্রপল্লী, আরও একটু দূরে গণ্ডারদের গণ্ডগ্রাম। অনেকখানি জায়গা তাদের জলের পরিখা দিয়ে ঘেরা। হাতীরা প্রতিদিন উট এবং গণ্ডারদের অবস্থা চেয়ে চেয়ে দেখেছে। তারা কেউ পেট ভরে খেতে পায় না। নিশ্চয় তারা বিদ্রোহে যোগ দেবে।

হাতীরা ঠিক করল তারা সবাইকে ডেকে একসঙ্গে পরামর্শ করবে। কিন্তু কি ভাবে ডাকা যায় সেই হল এক সমস্যা।

এক উপায় হচ্ছে, তারা প্রথমে উটকে জানাবে, উট হরিণকে জানাবে, হরিণ গণ্ডারকে জানাবে—এইভাবে খবরটা সমস্ত পশুশালায় 'রিলে' করা যেতে পারে। কিন্তু তাতে বিপদ আছে। এভাবে জানাতে গেলে অত্যন্ত দেরি হবে, তা ছাড়া জানাজানি হয়ে যেতে পারে। মানুষেরা যদি টের পায় পশুপাখীরা বিদ্রোহ করবে, তা'হলে এমন কড়া শাসনের ব্যবস্থা হবে যে তারা জীবনে আর মুক্তি পাবার কল্পনা করতে পারবে না।

হাতীদের মধ্যে যে প্রধান, সে এই সব কথা ভাবছিল, এমন সময় একটা পায়রা উড়ে এসে হাতীর কাছে বসল। পায়রাকে দেখেই হাতীর হঠাৎ মনে হল এর সঙ্গে বন্ধুত্ব করলে তো এর সাহায্যেই পশুশালার সমস্ত জীবজন্তুকে খবর পাঠানো যেতে পারে। এই ভেবে সে খুব সহজেই পায়রার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'রে ফেলল। হাতীকে পশু-শালার দর্শকেরা ছোলা খেতে দেয়—হাতীর কাছে অনেকগুলো সেই রকম ছোলা পড়ে ছিল ; হাতী পায়রাকে বলল, ভাই পায়রা এই ছোলাগুলো তুমি খাও। শুঁড় দিয়ে ছোলাগুলো সে দেখিয়ে দিল।

পায়রা তো মহা খুশী। ছোলা খেতে তার বড় ভাল লাগে, তাই হাতীর উপর সে খুব কৃতজ্ঞ হল। বলল হাতী, তুমি যখন আমার

সঙ্গে বন্ধুর মতো ব্যবহার করেছ তখন আমিও তোমার জন্যে কিছু করতে চাই, বল কি করব।

হাতী খুশি হয়ে বলল, একটুখানি কাজ যদি আমার জন্যে কর তা'হলে তো খুবই ভাল হয়। তুমি পায়রা—তোমাকে তো আর অসম্ভব কোনো কাজ করতে বলা চলে না, তোমার পক্ষে সহজ হয় এমন কাজই তোমাকে দেব। আমি একখানা চিঠি লিখে তোমার হাতে দেব, তুমি সেই চিঠি নিয়ে এখানকার সব পশু আর পাখীদের দেখাবে। পারবে?

পায়রা শুনে বলল, এই কাজ? এ আর এমন কঠিন কি? আমরা তো ডাকপিয়নেরই জাতি—যুদ্ধের সময় চিঠি বিলির কাজ আমরা বহুকাল ধরে করে আসছি। তবে একটা জায়গায় কিছু অসুবিধা হবে।

কোথায়?

সাপ আর কুমীরের ঘরে।

আচ্ছা সে ব্যবস্থা আমি অন্যভাবে করব, তুমি আর সবাইকে তো আগে দেখাও চিঠিখানা।

তা হ'লে দাও চিঠি, আমি এখনি নিয়ে যাচ্ছি।

হাতী বলল, এখনও লিখিনি সে চিঠি। তুমি কাল এসো, কাল আমি চিঠি তৈরি ক'রে রাখব।

হাতী একটা পাতা যোগাড় ক'রে তার উপর লিখতে লাগল তার সব কথা। তোমরা ভাবছ একটা পাতায় কি ক'রে চিঠি লিখবে? কিন্তু ওদের ভাষা তো আর আমাদের মতো নয় যে লিখতে অনেক জায়গা লাগবে। ওরা কতকগুলো চিহ্ন ব্যবহার করে—চীনেদের অক্ষরের মতো। চিনেদের এক একটা অক্ষরের মধ্যে অনেক কথা থাকে—ওদের ভাষাও সেই রকম লিখতে হয়।

হাতী লিখল—"পশুশালা নিবাসী বন্ধুগণ, আগামীকাল রাত্রে

আমাদের হাতীপাড়ায় জরুরী এক সভা বসছে। তোমরা সবাই গোপনে সেই সভায় আসবে। আমরা সবাই এখান থেকে পালাবার উপায় খুঁজছি। মানুষের হাতে এভাবে বন্দী হয়ে সমস্ত জীবন কাটিয়ে লাভ কি? আমরা পশু হয়ে জন্মেছি—পশুর মতো বাঁচতে চাই। মনে রেখো, আগামীকাল রাত বারোটায়। আমি জানি সভায় আসতে হ'লে তোমাদের মধ্যে অনেকের খাঁচা ভাঙতে হবে, অনেকের দেয়াল টপকাতে হবে, অনেকের জলের পরিখা সাঁতার কেটে পার হয়ে আসতে হবে। কিন্তু আমার অনুরোধ, তোমরা নিশ্চয় আসবে। ইতি তোমাদের একান্ত বন্ধু—প্রধান হাতী।

পশুশালার পশুপাখীরা এই চিঠি পড়ে খুবই উৎসাহিত হয়ে উঠল। তারা প্রত্যেকেই বন্দীজীবনের বেদনায় এতকাল মনমরা হয়ে দিন কাটাচ্ছিল, কিন্তু উদ্ধারের তো কোনো উপায় নেই, তাই তারা এ নিয়ে আর কিছু ভাবেনি। আর তা ছাড়া এ নিয়ে যে ভাবা যায় এবং এক সঙ্গে মিলে আলোচনা করলে মুক্তির একটা উপায়ও বের হ'তে পারে এ কল্পনা তাদের মাথায় কখনও জাগেনি। তাই তারা সবাই জানাল তারা হাতীপাড়ায় নিশ্চয় উপস্থিত হবে পরদিন রাত বারোটায়।

হাতী তা শুনে নিশ্চিন্ত হল।

পায়রার কাজ কিন্তু ঐখানেই শেষ হল না, সে বন্ধুত্বের খাতিরে অন্যান্য পশুপাখীদের মধ্যেও এই সভা সম্পর্কে অনেক খবর দেওয়া-নেওয়া করল সারাদিন ধ'রে। পাখীরা বলল তারা রাত্রে চোখে দেখে না, কি ক'রে যাবে? তা শুনে জিরাফ বলল, আমি তোমাদের বয়ে নিয়ে যাব। আমার মস্ত লম্বা ঘাড় আছে তাতে পঁচিশটি এবং পিঠে পনেরোটি পাখী এক সঙ্গে বসে যেতে পারবে। কচ্ছপ বলল আমার পিঠে একটি ক'রে পেলিক্যান পাখী বেশ যেতে পারবে। আমরা অনেকগুলো আছি—দশ বারো বার যাতায়াত করলেই সমস্ত পেলিক্যানকে হাতীপাড়ায় পৌঁছে দিতে পারব।

বানরেরা বলল তারা তাদের লেজকে এতদিন পরে সৎকাজে লাগাবার সুযোগ পেল। উটপাখীগুলোর পায়ে লেজ জড়িয়ে অন্ধকারে ধীরে ধীরে তারা পথ চলতে সাহায্য করবে।

গণ্ডার জলহস্তী ভালুক বাঘ সিংহ প্রভৃতি জন্তুরাও এক রাত্রির জন্যে তাদের ঘেরা জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে ব'লে জানাল।

রাজী হল না কেবল বাদুড়। পায়রা ভুল ক'রে ওদের কাছে চিঠি নিয়ে গিয়েছিল। দিনের আলোয় ওরা আবার চোখ মেলে চাইতে পারে না, তাই চিঠি পড়তে পারল না, তখন পায়রা তাদের কাছে চিঠিতে কি আছে জানাল। তারা বলল, পশুশালার আইনে আমরা পড়ি না, কারণ এখানে আমরা স্বাধীনভাবে আছি, কারো ষড়যন্ত্রে এখানে আসি নি, আমরা এখানে বন্দী নই, সম্পূর্ণ স্বাধীন। তা ছাড়া আমরা তোমাদের কোনো কিছুর মধ্যে যেতে চাই না, কারণ আচারে ব্যবহারে আমরা তোমাদের চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। আমরা সমস্ত দিন পা আকাশের দিকে তুলে গাছের ডালে ঝুলে থাকি, তোমাদের পা সে সময়ে থাকে মাটিতে।

পায়রা বলল, তোমরা রাত্রে চোখে দেখ, তাতে এক রাত্রির জন্যে এখানকার অনেকের পথ দেখিয়ে সভায় পৌঁছেও তো দিতে পার।

বাদুড় বলল, না তা করব না, কারণ সমস্ত রাত্রি আমাদের খাদ্যের ধান্ধায় ঘুরতে হয়।

পায়রা ওদের আশা ত্যাগ ক'রে চলে গেল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও সেদিন রাত্রে ওদের সভা জমল। সভায় প্রায় সকল প্রাণীই উপস্থিত হল, কিন্তু বারোটায় আসতে পারল না সবাই, জলহস্তীর আসতে রাত দুটো বেজে গেল; আর যারা রাত্রে চোখে দেখে না, তাদের টেনে টেনে আনতেও অনেক দেরি হল। কিন্তু তাতে কোনো অসুবিধা হল না কারোই। এই বিলম্ব সত্ত্বেও অন্যরা ধৈর্য ধ'রে অপেক্ষা করল হাতীপাড়ার সভায় বসে।

সভায় প্রথম বক্তা হল হাতী। সে নানা যুক্তির সাহায্যে সবাইকে বুঝিয়ে বলতে লাগল এই বন্দী জীবনযাপন করা মৃত্যুর চেয়েও খারাপ। হাতী আরও বলল, তোমরা সবাই জান আমি এখানকার সবার চেয়ে আকারে বড়।

ওরা খুব মনোযোগ দিয়ে হাতীর কথা শুনছিল, কিন্তু "সবার চেয়ে বড়" এই কথাটা শুনে জিরাফ একটি কথা না বলে পারল না। সে বলল, ওজনের দিক দিয়ে সে কথা খুবই ঠিক।

হাতী বলল, মাপ কর ভাই জিরাফ, আমি তোমার উচ্চতার কথা ভুলিনি, কিন্তু ঐ সব খুঁটিনাটি মাপের কথা এখন আর বলবার সময় নেই ; কার গলা লম্বা, বা কার লেজ খাটো, এ সব কথা অবাস্তব। আমি যা বলছি একটু মন দিয়ে শোন।

জিরাফ বলল, তোমার বক্তৃতায় বাধা সৃষ্টি করার জন্যে আমি দুঃখিত, আমি আর কোনো মন্তব্য করব না, তুমি বলতে থাক।

হাতী বলতে লাগল, এই যে এত বড় দেহধারী আমি, এই আমি যখন আমাদের আদি বাসস্থান জঙ্গলে ছিলাম তখন কি প্রচণ্ড শক্তি ছিল আমার মধ্যে। আমরা দল ধরে বাস করতাম। সে সময় আমাদের সেই মিলিত শক্তি দিয়ে এই পৃথিবীতে প্রলয় ঘটানোও আমাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। সে শক্তির কি মহিমা। আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ কালো মেঘ জমে বোশেখ মাসে যখন প্রচণ্ড ঝড় উঠে আসে, তখন সেই ঝড়ের শক্তি তোমরা অনুভব করেছ। আমাদের ছিল সেই শক্তি। দলবদ্ধ আমরাও ছিলাম সেই কালবোশেখীর কালো পুঞ্জীভূত মেঘের মতো। কিন্তু ধূর্ত মানুষ আমাদের ফাঁদে ফেলে সেই শক্তি চূর্ণ করেছে—আমাদের প্রত্যেককে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে—ক'রে তাদের কাজে লাগাচ্ছে। কিন্তু সে পর্যন্তও আমরা ভাগ্যকে মেনে নিয়েছিলাম। মানুষের অধীন ছিলাম কিন্তু খোলা জায়গায় কাজ করবার একটা আনন্দ তবু অনুভব করতাম। কিন্তু পশুশালায় আমাদের এ কি অবস্থা? আমরা এখানে কি করছি? "কিছুই

করছি না” বলতে পারলেও সুখী হতাম, কিন্তু তা বলতে পারছি না। এখানে শিকল দিয়ে আমাদের পা বেঁধে রেখেছে। খেতে দিচ্ছে না। কি ভীষণ খেতে পারি আমরা। স্বাস্থ্য রাখবার জন্যে দৈনিক লাখ লাখ ক্যালরি খাদ্য দরকার আমাদের, কিন্তু হাজার খানেক পাই কি না সন্দেহ। কিন্তু স্বাস্থ্য চুলোয় যাক, কোনো রকমে পেটটা ভরাতে পারলেও চলত, কিন্তু পেট আমাদের প্রতিদিন সিকি পরিমাণও ভরে না। মানুষেরা আসে আমাদের দেখতে। নিষ্ঠুর মানুষ! কেউ কেউ আবার দয়া ক'রে দু এক পয়সার ছোলা কিনে আনে আমাদের জন্যে। এক বিঘে জমির সমস্ত ছোলা একেবারে খেলে তবে আমাদের খাওয়া হয়, সেখানে দু পয়সার ছোলা খাইয়ে পশুর প্রতি কি দয়াই না প্রকাশ করে ওরা। অপমানের পর অপমান—সে ছোলাও আবার তারা সহজে দেয় না। তার আগে তাদের সেলাম করতে হয়, অথবা মাটিতে ফেলে দেওয়া ছোট্ট একটি আনি বা দু আনি শুঁড় দিয়ে খুঁটে তাদের হাতে তুলে দিতে হয়।

বলতে বলতে হাতীর দুচোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। সে উচ্ছ্বসিতভাবে ব'লে চলল, আমাদের মতো সম্মানীয় প্রাণীর পক্ষে দুটো ছোলা খাওয়ার জন্যে এই হীনতা স্বীকার করা কি মৃত্যুর চেয়েও শতগুণে খারাপ নয়?

উপস্থিত সবাই সে কথা স্বীকার করল।

হাতী জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের অবস্থাও কি আমার চেয়ে কিছু মাত্র উন্নত?

সবাই সমস্বরে বলল, কিছুমাত্র না।

হঠাৎ জিব্রা বলে উঠল, আমার কিছু নিবেদন আছে। সম্মানীয় বক্তা তাঁর নিজের অবস্থা যা বর্ণনা করলেন তাতে তাঁর হীন অবস্থার কথা আমরা সবাই বেশ বুঝতে পেরেছি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যদিও পশু হিসাবে আমাদের কোনো তুলনাই হয় না, তবু আমি মনে করি আমাদের অবস্থা ওঁদের চেয়েও কিছু খারাপ। আপনারা জানেন

আমাদের গায়ে কতকগুলো সাদা কালো দাগ আছে, তাতে আমাদের দেহে কিছু নতুন সৌন্দর্য হয় তো আছে, কিন্তু ঐ সব দাগ বাদ দিলে আমরা গাধা ছাড়া আর কি? গাধাকে আমি অপমান করছি না, আমি শুধু মানুষের চোখে গাধা কি রকম দেখায় তাই বলছি। মানুষেরা গাধাকে দু চোক্ষে দেখতে পারে না—আর গাধার মতো দেখতে ব'লে আমাদেরও দেখতে পারে না। আর সে জন্যে আমাদের যে শাস্তি ভোগ করতে হয় তা বললে আপনারা চমকে যাবেন। মানুষ কিছু খেতে দেবে বলে তাদের কাছে যখনই ছুটে যাই এবং গিয়ে হাঁ করি—তারা তখন মজা সৃষ্টির জন্যে যে কোনো জিনিস আমাদের মুখে পুরে দেয়। কখনও দেশলাই কাঠি, কখনও একটুকরো কাগজ। আমরা খিদেয় তখন দিশেহারা—মুখে কিছু দিলেই মনে করি খাদ্য দিয়েছে—কত আশা ক'রে চিবোতে যাই, কিন্তু তখনি বুঝতে পারি মানুষ আমাদের এমন দুরবস্থাতেও আমাদের সঙ্গে নিষ্ঠুর রসিকতা করেছে।

একথা শুনে সবাই মানুষের প্রতি অতি কঠিন ঘৃণা প্রকাশ করল।

তার পর একে একে বাঘ সিংহ জিরাফ, হনুমান, ক্যাঙারু কচ্ছপ, হায়েনা, শূয়োর, হরিণ, উট, গণ্ডার, জলহস্তী, ভালুক, তাদের সমস্ত অসুবিধার কথা সংক্ষেপে বলল। দেখা গেল বাঘ এবং সিংহের অবস্থা স্বভাবতই সব চেয়ে শোচনীয়। হাতীরা নিরামিষ খায়, কাজেই খাদ্য সংগ্রহে পাশবিকতা প্রকাশ করতে হয় না। কিন্তু সিংহ, বাঘ প্রভৃতি জন্তু, শিকার ধরার আনন্দে বঞ্চিত থেকে অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে। হাতীর দুঃখের মধ্যে মান অপমানের প্রশ্ন আছে, সেও কম নয়, কিন্তু সিংহ বাঘকে মানুষের মারা জন্তুর মাংস খেতে দিয়ে মানুষ তাদের প্রধান ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেছে।

পাখীরা, বিশেষ ক'রে পেলিক্যান এবং হাঁস যদিও বন্দিত্বের জ্বালা ততখানি অনুভব করে না, তবু তারাও যে মুক্তি সাধনায় সবার সঙ্গে সহানুভূতিসম্পন্ন এ কথা তারা খুব জোরের সঙ্গেই প্রকাশ করল।

সভায় কুমীর এবং সাপ অনুপস্থিত থাকাতে হাতী কিন্তু দুঃখ প্রকাশ করল, কিন্তু ওদের বাদ দিয়েও পশুশালানিবাসী পশুপাখীদের যে এটা সর্বদলীয় সভা হয়েছে এ বিষয়ে সকলেই এক-মত হল। কুমীর এবং সাপ আসেনি কারণ সভার সংবাদ তাদের কাছে পৌঁছে দিতে কেউ রাজি হয়নি।

ওদের সভায় বক্তৃতা শেষে পরামর্শ শুরু হল। মুক্তি যখন সবাই চায়, তখন মুক্তির উপায় পরিকল্পনাতে সবাই আনন্দের সঙ্গে যোগ দিল। ওরা ঠিক করল একদিন রাত্রে সবাই পশুশালার দেয়াল ভেঙে বেরিয়ে যাবে। একসঙ্গে সবাই যদি ছুটে বেরিয়ে যায় তাহ'লে শহরের পথে আর কেউ তাদের আটকাতে পারবে না। শহর পার হয়ে গেলে আর তাদের কোনো ভয় নেই।

পাখীরা অনেকে তো আকাশ পথেই যাবে, সুতরাং তাদের জন্যে কোনো ভাবনা নেই। ক্যাঙারু বলল, আমার জন্যেও আমি ভাবি না, এখানকার দেয়াল যদি টপকাতে পারি তা হ'লে এক লাফে অস্ট্রেলিয়া চলে যাব। বাঘের বাড়ি তো বাংলাদেশেই, সে বলল কয়েক মাইল পার হ'লেই একেবারে খুলনা চলে যাব। আমার জন্মস্থান সেটা—একেবারে পশর নদীর পূব পারে। সিংহ বলল, আমি ভাবছি হিমালয়ের দুর্ভেদ্য জঙ্গলে যাব। মানুষের ত্রিসীমানায় থাকলে আমাকে আবার ধরবে। হাতী বলল, আমরা আবার ফিরে যাব আসামে—সেইখান থেকেই আমরা এসেছি। বাঘ বলল তোমার 'দন্ত্য স' কে 'হ' বলা শুনেই তা বুঝতে পেরেছি। হাতী বলল, তোমারও উচ্চারণে বেশ একটা টান আছে—তুমি যে চব্বিশ পরগনার বাইরে থাক সে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

এসব শুনে সবাই বেশ কৌতুক অনুভব করতে লাগল—কারণ ওদের মনে আজ খুব উৎসাহ জেগে উঠেছে। জলহস্তীও রসিকতা করতে চেয়েছিল কিন্তু তার কোনো কথাতেই কেউ হাসল না। সে আপন মনেই বলল, একবার গঙ্গায় গিয়ে পড়তে পারলে যেমন ক'রেই হোক

আফ্রিকায় চলে যাব। অন্যান্যরাও তাদের নিজ নিজ দেশের নাম করল।

কিন্তু আপাতত প্রধান বাধা হাতীদের পায়ের শিকল। শিকল কি ভাবে কাটা যাবে? হনুমান বলল, সে ব্যবস্থা দাদা, আমি করে দেব। প্রতি রাত্রে একটু একটু ক'রে করাত চালাতে হবে—মানুষেরা টের না পায় এমনিভাবে। আমি বাইরে থেকে শিকলকাটা করাত সংগ্রহ করে আনব, আমিই কাটবার ভার নেব। তোমাদের শিকল না কাটলে তো আমরা মুক্তি পাব না, কারণ তোমরাই পশুশালার দেয়াল ভাঙবে আগে—আমরা তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাব।

ওদের বাহিনী কিভাবে তৈরি হবে তাও ঠিক হয়ে গেল। পাখীরা হবে বিমান বাহিনী। জিরাফদের মাথা সবার উঁচু থাকাতে ওরা দূরবীনের কাজ করবে—শত্রু পক্ষের চলাফেরা লক্ষ্য করবে। গণ্ডারদল অতিকায় ট্যাঙ্কের কাজ করবে—আর কচ্ছপেরা হবে সাঁজোয়া বাহিনী। হাতী আর শূয়োরেরা বলল তারা হবে স্যাপার ও মাইনার। (sappers and miners)—এরা পথের সকল বাধা দূর ক'রে আগে আগে চলবে। পদাতিক বাহিনী গঠন করবে বানরেরা—হনুমানদের সঙ্গে থেকে। রামায়ণের যুগ থেকে তারা এ কাজে অভ্যস্ত। জলহস্তীরা নৌবাহিনী হ'তে রাজী হল—কারণ ওরা এক একটা যুদ্ধ জাহাজের মতো। বাঘ আর সিংহরা মিলে কামান বাহিনী বা আর্টিলারি গঠন করবে। ওদের গর্জনও যেমন ভীষণ আক্রমণও তেমনি মারাত্মক।

এমন সময় দেখা গেল ওদের পাশে কখন কুমীরেরা আর সাপেরা এসে হাজির হয়েছে। তারা এসেই বলল আমরাও তোমাদের মুক্তি যুদ্ধে ভলান্টিয়ার হ'তে এসেছি। ওদের দেখে সবাই খুব খুশী হল। কুমীররা বলল আমরা হব ডুবোজাহাজ—আমরা টর্পীডো মারব। সাপেরা বলল আমাদের বিষাক্ত অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার ক'রো যদি দরকার হয়।

গত মহাযুদ্ধের সব খবরই এরা জানত, কারণ সে সময় এদের অনেককেই পশুশালা ছেড়ে বাইরে যেতে হয়েছিল বোমার আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্যে। তাই তারা ঠিক মহাযুদ্ধের ধরনেই ওদের বাহিনী গড়বে ব'লে ঠিক করল কিন্তু আগেই বলেছি হাতীকে সকলের আগে মুক্ত করা দরকার। হাতীর শিকল কাটার কাজ কিন্তু ওরা আরম্ভ করেছে। প্রতিদিন রাত্রির অন্ধকারে সেই কাজই চলছে। তোমরা যদি পশুশালায় যাও দেখতে পাবে, কিন্তু কথাটা আর কাউকে ব'লো না।

সিংহের খাঁচায়

চিড়িয়াখানা জায়গাটি ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি তোলার পক্ষে ভারি সুন্দর। ওরা যখন অবাক হয়ে সব দেখে, তখন ওদের দেখি আমি, কারণ আমার হাতে ক্যামেরা থাকে। সেদিন আমার সঙ্গে গিয়েছিল ফুলু—অর্থাৎ ফুল্লরা। বারো বছরের মেয়ে। বালিগঞ্জে তাকে চেনে অনেকেই, বড় ভাল মেয়ে। মাথায় ঝাঁকড়া চুল, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এমন করে রাখে যে মনে হয়—কিন্তু কি মনে হয় তা আগেই বলব না। সব জিনিসে তার কৌতূহল, সব সময় চোখ দুটি তার খোলা, সব সময় তার ভয় পাছে কোন জিনিস তার অদেখা থাকে। সব সে দেখতে চায়, বর্ষাকালে ভিজে ভিজে ফুটবল খেলাও দেখে তার বাড়ির সামনের মাঠখানায়। চিড়িয়াখানায় গিয়ে তাকে নিয়ে হল বিপদ। এক একটা পাখি বা জন্তু যা দেখে, সেইখানেই দাঁড়িয়ে যায়। চোখ দুটি বড় বড় ক'রে তাদের দেখে, দেখা আর শেষ হয় না। সিংহের কাছে গিয়ে ফুলু যেন আর নড়তেই চায় না। ঝাঁকড়া চুলো সিংহটা খাঁচার মধ্যে অস্থিরভাবে পায়চারি করছে। অতবড় একটা জানোয়ার তাকে অতো ছোট একটা ঘরে, তাই বোধহয় সে সব সময় ভীষণ চটে যাচ্ছে। ফুলু ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়ে সিংহটাকে দেখল। আমি ওকে না জানিয়ে ওর ছবি তুলছিলাম, তখন আমার মনে হচ্ছিল, ফুলুরও যেন ঠিক সিংহের মতোই কেশর গজিয়েছে মাথায়। যেন ছোট একটা সিংহ সে নিজেই, শুধু চোখ দুটি হরিণের, আর মনটা? সেকথা না বলাই ভাল। কি দুঃখ তার, পশুদের খাঁচায় রেখেছে বলে। "এদের সব এমন করে বন্দী করে রেখেছে কেন যে!" বড় বেদনার সঙ্গে বলল ফুলু। আমি একটু কৌতুক ক'রে বললাম, "ওরা তো পশু, মানুষও মানুষকে খাঁচায় পোরে মাঝে মাঝে।" ফুলু বলল, "বারে! তাই

আবার হয় নাকি ?" বলার ইচ্ছে ছিল, 'তোমাকে একদিন সবাই মিলে খাঁচায় পুরবে, সেদিন বুঝতে পারবে।'—কিন্তু বললাম না, কারণ বুঝত না কথাটা এরপর দিন তিনেক কেটে গেছে, আমি ওর ছবি তৈরি করে নিয়ে গিয়েছি ওকে দিতে। কিন্তু ছবিগুলো আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে একটু চোখ বুলিয়েই সে রেখে দিল পাশে। আমি বললাম, "পছন্দ হল না বুঝি ?" ফুলু ভীত চোখে আমাকে বলল, "আমি আর চিড়িয়াখানায় যাব না, আপনিও যাবেন না।" আমি তো অবাক! ফুলু বলল, "কাল রাতে এক ভয়ানক স্বপ্ন দেখেছি, ভীষণ ভয় হচ্ছে আমার।" আমি বললাম, "স্বপ্নে কি দেখেছো তা নিয়ে ভাবছ কেন এত ?" "কিন্তু তাকে স্বপ্ন বলে ভাবতে পারছি না, সত্যি মনে হচ্ছে।" "তা হলে সব আগে বল।" ফুলু বলতে লাগল 'সে কি ভীষণ, এখনও আমার গা কাঁপছে। আমি যেন একা সেখানে, আপনাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না। এমন সময় খাঁচা থেকে সেই প্রকাণ্ড সিংহটা বেরিয়ে এসে আমার সামনে দাঁড়াল। তাকে দেখে আমি চিৎকার করে ছুটতে চেষ্টা করলাম, কেন যেন আমার গলা দিয়ে শব্দ বেরুল না, পাও চলল না! যত ছুটি দেখি একই জায়গায় আছি! সিংহ তা দেখে এমন বিকট ভাবে হেসে উঠল যে আমার দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি! আমাকে বলল, আমাকে এভাবে খাঁচায় বন্ধ করে রেখেছ কেন ? আমি বললাম, কৈ আমি তো রাখিনি। তুমি না রাখ তোমাদেরই এক মানুষ রেখেছে তো ? কে রেখেছে আমি জানি না। আমি তো কিছু করিনি। আমাকে কিছু বলো না তার জন্যে। সিংহ বলল, যেই রাখুক তার শাস্তি পাওয়া দরকার। আমি তখন একটু সাহসের সঙ্গে বললাম, জঙ্গলে থাকলে তো তোমাকে কষ্ট করে শিকার ধরতে হত ; এখানে তোমাকে মানুষই তো খেতে দেয়— তবে রাগছ কেন ? খেতে দিলেই বুঝি সব হয় ? রোজ রোজ খাঁচায় থাকতে ভাল লাগে ? রবিবারটাও যদি ছুটি দিত! মাত্র একদিনের জন্যে। জান না তো রবিবারে মনটা যে কি রকম খারাপ হয়ে যায়।

আমি বললাম, তুমি তো আর স্কুলে পড় না তোমার আবার রবিবার কি? সিংহ চটে গিয়ে বলল, তা নয়। ছুটি একদিন সবারই দরকার। মানুষ আমাকে সেই ছুটি দেয় না। মানুষের এত অহংকার কিসে, তা আমি একবার দেখতে চাই। চল আমার সঙ্গে। যেতেই হল তার সঙ্গে। আপনার কথা মনে হল, কোথায় যে গেলেন আপনি আমাকে একা রেখে। আমার কান্না পেতে লাগল, কিন্তু কেঁদে লাভ হবে না জেনেই চুপ করে রইলাম। চিড়িয়াখানার বাইরে গিয়ে একখানা ট্যাক্সি ডেকে আমরা দুজনে গিয়ে বসলাম তাতে। খোলা ট্যাক্সি। সিংহ আর আমি পাশাপাশি বসে। পথের দুধারের লোকেরা হেসেই অস্থির! সিংহ তা দেখে ভীষণ চটে যাচ্ছিল মনে মনে। তার গলা থেকে গুরু গুরু শব্দ হচ্ছিল, ঠিক যেন বহু দূরের মেঘের ডাক! কিছুদূর গিয়েই সিংহ বলল এযে দেখছি মাঠ। যেখানে অনেক মানুষ আছে সেখানে নিয়ে চল। গেলাম আমরা বড় বাজারের দিকে, কারণ সেখানে লোকের খুব ভিড় একদিন দেখেছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে যা বলছি তাই শুনছে; সাধ্য কি না শোনে? টাকা তো চাইতে পারবে না, বোঝাই গেল। লোকটি পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহের জ্ঞাতি হলে কি হবে, আসল সিংহের কাছে সবাই কাবু। কিন্তু মানুষের এই চেহারা দেখে সিংহের চোখ দুটি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মনে হল যেন সে একটু একটু হাসছে। বড় বাজারের মানুষগুলো দেখে আমারও কেমন লজ্জা হতে লাগল। কেউ বোঝাই করা ঠেলাগাড়ি ঠেলছে, কেউ মাথায় করে মোট বইছে, কেউ গরুর গাড়ি চালাচ্ছে, তাদের মুখে ফেনা উঠে গেছে গোরুগুলোর মতোই। অসম্ভব ভিড়, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটি, চিৎকার। তার মধ্যে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, লরি। কেলেঙ্কারি কাণ্ড! একটি বেলা বড় বাজার ঘুরে ঘুরে, সব দেখলাম। মাঝখানে সিংহ কয়েকটি ডাবের জল খেয়ে নিয়ে ছিল, আমি কিছুই খেলাম না, খাবার কথা মনেও এলো না। ওখান থেকে বেরিয়ে এসে সিংহ বলল, এরা সব মানুষ? আর এরাই আমায় খাঁচায় পুরেছে?

ভাস্বরকের ভাগ্য

রাজা ভাস্বরক ফরাসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন। তাঁর রাজমস্তকে তেল মালিশ করছেন রাজভৃত্য। রাজার মাথায় কেশরের দারুণ অভাব, দেখতে বিশ্রী, মনে হয় টাক পড়বে। জুনাগড়ের গির জঙ্গলের রাজত্বে তাঁর শ খানেক পুরুষ জ্ঞাতি আছেন, তাঁদের মাথায়ও ঐ একই অবস্থা। তবু যদি এই তেলে ঘন কেশর গজায়। রীতিমত বিজ্ঞাপন দেখে কেনা কিনা, যদি কেশর গজায় তবে, জ্ঞাতি-কুটুম্বদেরও দেওয়া যাবে এক বোতল করে। রানীদের মাথায় তো কেশরই নেই, তাদের ভারী সুবিধা।

ভাস্বরক আগেও নানা তেল মেখেছেন, কিন্তু সব ধাপ্পা। এবারের নামটা তাঁর বড় পছন্দ, মহাকেশরাজ তৈল নবরত্নভস্ম মেশানো। কেশরাজ মানেই বা কী, ভগবান জানেন।

ভাস্বরক চোখ বুজে আরামে ভাবছেন: আমাদের ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দারা যখন ইউরোপে থাকতেন তখন তাঁদের কেশরের ভাবনা ছিল না। এখন তো সেখানে সিংহই নেই। তাঁরা গিয়ে জুটেছেন আফ্রিকায়। কেশর আমাদের একটা গর্বের জিনিস। হায় হায়, আমাদের ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দারা যদি তখন বুদ্ধি করে এই হতভাগা জুনাগড়ে না আসতেন, তাহলে কত ভালই না হত।

রাজভৃত্য বানর তেল মাখাতে মাখাতে ভাবছেন: পশুরাজ কী বোকা! তেলে কখনো কেশর গজায়? কিন্তু সে কথা তো আর মুখে বলা যায় না, বললেই চাকরিটি যাবে।

ভাস্বরক ভাবছেন: সবাই মিলে এখন আফ্রিকায় চলে গেলে হয় না? কিন্তু···সরকার অনুমতি দেবে না। পাসপোর্ট দেবে না। রিজার্ভ ব্যাংক টাকা দেবে না।···উঃ একেই বলে বেঁধে মারা!

রাজভৃত্য ভাবছেন ঃ বোকা রাজার চাকরিতে কিছুই সুখ নেই, ভাণ্ডার থেকে বড় রকমের চুরিও কিছু করতে পারি না, যা করি তার নাম ছেঁচড়ামি। সেই সেকালে আমাদের ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দার ঠাকুদ্দারা রামের চাকরিতে কী সুখেই না ছিলেন। সেই রামের সঙ্গে যুদ্ধ করা, সেই সীতা উদ্ধারে সাহায্য করা···উঃ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

ভাস্বুরকের হঠাৎ মনে হল কেশরাজ মানে কী ? এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে খোঁচা মারছে, তা হলে তো জানতে হয় মানেটা। তিনি রাজভৃত্য বানরকেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ওহে মর্কট, তেল তো মাখাচ্ছিস, কেশরাজ মানে কী জানিস ?

রাজভৃত্য বললেন, আমি মূর্খ বান্দর, আমি কি কোন কিছুর মানে জানি, মহারাজ ? আপনি না হয় মন্ত্রী মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন। বান্দরের কাছে কি কেউ মানে জিজ্ঞাসা করে ?

ভাস্বুরক বললেন, ওহে বানর, তুই ঠিক বলেছিস, কথাটি আমার ভাল লাগল। এ মাস থেকে তোর মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

রাজমন্ত্রীকে ডাকা হল। রাজমন্ত্রী হনুমান। রামের বন্ধুর বংশধর। তিনি শুনে বললেন, বড় কঠিন প্রশ্ন, মহারাজ। আমার মনে হয়, যে কেশরাজ নাম মহারাজের এত পছন্দ, তার মানে এত সহজ হতেই পারে না। সহজ হলে কি ঐ তেল আপনার মাথায় উঠতে সাহস পেত ? এর অর্থ বলতে পারবেন সভাপণ্ডিত মশায়।

বুদ্ধিমানের কথা বলছে মন্ত্রী, খুব বুদ্ধিমানের কথা। এ মাস থেকে তোমার মাইনে দু টাকা বাড়িয়ে দিলাম। ডাক পণ্ডিতকে।

রাজভৃত্য বললেন, আর তেল মাখাব না ?

না। আগে মানেটা বুঝি।

সভাপণ্ডিত এলেন। তাঁর মুখ ছুঁচলো, চোখে চশমা, গায়ে

সিলকের ফতুয়', চোখে চটুল দৃষ্টি, ল্যাজ ফাঁপানো, তার ভিতর নানা উপাধি গোঁজা, তাইতে ল্যাজটা মোটা দেখাচ্ছে বেশী। পণ্ডিত এগিয়ে এসে ভাস্বরককে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন,—ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?

ভাস্বরক বললেন, মাথায় যে তেল মাখছি তার নাম মহাকেশ-

রাজ। এখন বলতো পণ্ডিত, কেশরাজ মানে কী? মানে না জানলে তেলটা মাখা ঠিক হয়েছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পণ্ডিত ভাবলেন, এতো মহামুশকিলে পড়া গেল। ভয়ে তাঁর লেজটা কাঁপতে লাগল।

দেরি দেখে রাজা গর্জন করে উঠলেন। ভাবছ কি পণ্ডিত, ঝটপট বলে ফেল, নইলে এমাস থেকে তোমার মাইনে দু টাকা কমিয়ে দেব।

পণ্ডিত জোর করে একটু হেসে বললেন, ভাবছি না কিছু ম-মহারাজ।

ভাবছ না, তবে লেজ কাঁপছে কেন?

আনন্দে ম-মহারাজ। অর্থ সোজা। এটা একটা সন্ধির ব্যাপার। তার মানে, কেশর+আজ=কেশরাজ। তার মানে আজ মাখলে আজই কেশর গজাবে।

যদি না গজায়?

তা হলে জানা যাবে ঠকিয়েছে।

ঠকিয়েছে? ঠিক তাই। একবেলা ধরে মাখছি, কেশর যা ছিল তাই আছে, একটাও বেশি গজায়নি। তোমরা ঠিকানা দেখে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা কর ওদের বিরুদ্ধে। সমস্ত গিররাজ্যে ঘোষণা করে দাও। পাঁচশো গাধাকে যুদ্ধ ঘোষণার কাজে লাগাও। সবাইকে যেতে হবে, আমিও যাব। যারা তেল তৈরী করে ঠকিয়েছে সেই চোরদের ধরে ধরে হাড় সুদ্ধ চিবিয়ে খেতে হবে।

উত্তেজনায় ভাস্বুরকের সকল গা কাঁপছে। গোঁফ ফুলে ফুলে উঠছে। যে কটা কেশর ছিল মাথায়, তাও খাড়া হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

যথা সময়ে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হবে, এমন সময় ভাস্বুরকের নামে এক চিঠি এলো। চিঠি পড়ে ভাস্বুরক ভীষণ গর্জন করে উঠলেন। এর মানে কী?

মন্ত্রী বললেন, কীসের মানে মহারাজ?

এই চিঠির মানে। আদেশ দাও যুদ্ধ এক ঘণ্টার জন্য স্থগিত

রইল। সব তৈরী থাক, এক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করতে হবে। তার পর মন্ত্রীকে বললেন, দেশী রাজাদের রাজত্ব আর থাকবে না, সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করবে, আর সব কী লেখা আছে মানে বুঝি না।… পণ্ডিত। পণ্ডিত!

ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া ম-মহারাজ?

শোন পণ্ডিত, এই যে লেখা আছে সোশ্যালিজম আসছে, এই কথাটার মানে কী? সোশ্যালিজম লোকটি কে? বিদেশী বলে বোধ হচ্ছে না? কিন্তু সে আসছে শুনেই আমাদের টাকা বন্ধ?

পণ্ডিত চিঠি নিয়ে অনেক চিন্তা করে বললেন, এইবার বুঝেছি ম-মহারাজ।

কী বুঝেছ?

ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব?

নির্ভয়ে বল।

তাহলে শুনুন ম-মহারাজ। সোশ্যালিজম কোনো মানুষ নয়। কথাটিতে কিছু ধাঁধা আছে। ওর প্রথম অক্ষরটি বাদ যাবে। তা হলে থাকবে শ্যালিজম। তার মানে…শেয়ালিজম। ম-মহারাজ, এবারে শেয়ালেরা কিছু করবে মনে হয়।

কী করবে?

সেইটিই তো ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হচ্ছে রাজ্য চালাবে। আর—

মন্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, পণ্ডিত মশায়, রাজাই যদি না থাকে, রাজ্য চালাবে কী করে?

পণ্ডিত বললেন, তা নয় রাজ্য থাকবে। চালাবে শেয়ালেরা।

এসব কথা শেষ হতে না হতে কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল শেয়াল সমাজে। ভাম্বুরকের সকল শেয়াল-প্রজা বনের মধ্যে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন, 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই শেয়াল রাজত্বে।'

ভাস্বুরক ভীষণ গর্জন করে উঠলেন, পণ্ডিত, একী শুনি? শেয়াল রাজত্ব মানে কী?

পণ্ডিত মাথা নিচু করে রইলেন।

মন্ত্রী বললেন, পণ্ডিত মশায়, আপনি সোশ্যালিজমের ভুল অর্থ করেছেন।

ভাস্বুরক উত্তেজিত ভাবে বললেন, ভুল অর্থ করেছে? তা হলে ওর মাইনে এ মাস থেকে অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হোক। বল মন্ত্রী, তাড়াতাড়ি বল, যুদ্ধে যেতে হবে।

মন্ত্রী বললেন, আপনি রাজা না থাকলে শেয়ালও রাজা থাকতে পারবে না।

ভাস্বুরক বললেন, পরে কী হবে চুলোয় যাক, রাজ্য চুলোয় যাক, টাকা চুলোয় যাক। কিন্তু আমি এখনও রাজা আছি তো?

অবশ্য আছেন। এবং আমি মন্ত্রী আছি। যখন শেষ আদেশ আসবে, তখন দেখা যাবে কী করা উচিত। এখন তো যুদ্ধে যাওয়া যাক।

ভাস্বুরকের আদেশে সেনাদল এক পা তুলেছে এমন সময় একটা পাখি এসে রাজার কানে কানে বললেন, মহারাজ কীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ?

চুরির বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে।

পাখি বললেন, সৈন্যদের থামতে বলুন।

ভাস্বুরক এই পাখিটাকে বড়ই ভাল বাসতেন। পাখির কথায় যুদ্ধযাত্রা আরো আধ ঘন্টার জন্য স্থগিত রইল, আদেশ পেলেই আবার মার্চ করবে।

ওটি একটি টিয়া পাখি। পাখি বললেন, মহারাজ, বাইরের চুরি থামাতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে যারা ঘিরে আছে যাদের আপনি বিশ্বাস করেন, তাদের চুরির কী হবে? আগে কাছের চোরদের ধরুন।

তারা কে বল তো?

বলছি একে একে। এই শেয়ালদের কথাই ধরুন। তারা সবচেয়ে বড় চোর। আপনাদের জন্য যত মাংস আসে তার অর্ধেক ওরা চুরি করে।

আমার সভাপণ্ডিত তো শেয়াল, সে-ও কি চোর?

সেই তো প্রধান চোর।

বলতে না বলতে দেখা গেল, পণ্ডিত এবং সেনাদলে যত শেয়াল ছিল, তার একটারও টিকি দেখা যাচ্ছে না। সব পালিয়েছে।

ভাস্বুরক স্তম্ভিত। জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মন্ত্রী? সে-ও চোর?

আপনার ভাণ্ডারের অর্ধেকের বেশি কলা আপনার ঐ মন্ত্রীর হাত দিয়ে তাঁর স্বজাতির মধ্যে চালান হয়ে যায়। যে রাজভৃত্য আপনার মাথায় তেল মালিশ করে, চাবিটা তার হাতে কে দেয়? আপনার ঐ মন্ত্রী।

বলতে না বলতে মন্ত্রী এবং মর্কট যাঁরা ছিলেন সব কোথায় যে গা ঢাকা দিলেন, বোঝা গেল না। সেনাদলে দেখা গেল একটা বানরও নেই। বোধ হয় মন্ত্রী সমেত তাঁরা গাছে উঠে ডালে ডালে লাফিয়ে রাজ্যের বাইরে চলে গেলেন।

ভাস্বুরক পাখিকে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ টিয়া, যাদের বিশ্বাস করেছি এতদিন, তারা সবাই চোর। কিন্তু আমার জাতিরা, তারা তো ভাল? না মহারাজ, তাদেরও চুরির শেয়ার আছে। প্রত্যেকে ভাগ পায়।

ভাস্বুরক সব শুনে তো পাথর হয়ে গেলেন। একবেলা ঠায় একই জায়গায় বসে থেকে সন্ধ্যার দিকে ধীরে ধীরে উঠে সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলেন। মন বড়ই খারাপ। পশুরাজের মন কিনা, তাই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।

ভাস্বুরক দূর থেকে দেখতে পেলেন, সমস্ত চোরাই জিনিস বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং সভাপণ্ডিত ল্যাজ পেতে বসে মালের হিসাব লিখছেন। অন্যান্য শেয়ালরা খুব ব্যস্তভাবে নানা জিনিস এনে সেখানে জড়ো করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ল্যাজের সঙ্গে একটি করে দু-চাকার চৌকো টানা গাড়ি! আর স্বয়ং মন্ত্রী মশায়কে দেখা গেল মস্ত একটা বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে হুশ করে আকাশ পথে উধাও হয়ে গেলেন।

ভাস্বুরক সব দেখে শুনে একাই খুব হাসতে লাগলেন। হঠাৎ সব উলটে যেতে দেখলে কার না হাসি পায়? কিন্তু রাজহাসি বেশিক্ষণ থাকে না। এটাই নিয়ম। ভাস্বুরকও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি হিংস্র হয়ে উঠলেন। তিনি ছুটে গিয়ে পণ্ডিত মশায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—পণ্ডিত মশায়ের গলা থেকে এবারে আর ক্যা হুয়া নয়, শুধু একটি কঁ্যাচ শব্দ বেরুল মাত্র।

ভাস্বুরক যখন তাঁর সভাপণ্ডিতের গলা থেকে দাঁত তুলে নিলেন তখন আর তিনি বেঁচে নেই।

পণ্ডিতের জাতিগোষ্ঠী সবাই তীর বেগে যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন, ভাস্বুরক আর রাজ্যে ফিরলেন না। কোথায় যে তিনি চলে গেলেন তা কেউ বলতে পারল না।

পরে জানা গেছে তিনি জলন্ধরের এক পাগলাগারদে বাস করছেন, আর থেকে থেকে 'মন্ত্রী, তোমার মাইনে দুটাকা কমিয়ে দিলাম,' 'পণ্ডিত তোমার মাইনে এক টাকা কমিয়ে দিলাম', 'কোটাল তোমাকে বরখাস্ত করলাম'—বলে হুঙ্কার ছাড়ছেন। তাঁর গলায় মস্ত এক মাদুলি বাঁধা। তাঁর মাথায় এখন রাজবৈদ্যরা তেল মালিশ করছেন।

—